লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব, জ্ঞানের সেই পরিবেশনকার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে বলে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথ্বী-পরিচয়

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে
বিজ্ঞানকে যিনি ভালোবাসতে শিখিয়েছেন
আমার সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম. এসসি.
মহাশয়ের হাতে এই ছোটো বইখানি
নিঃসংকোচে তুলে দিলুম।

ভূমিকা

বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান সহজে আয়ত্তগম্য নয় ব'লেই বিজ্ঞান-অধ্যাপনায় শিক্ষকেরা সচরাচর দুরূহ শব্দের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। দুর্বোধ শিক্ষার ভার দুর্গম ভাষার পথে বহন করতে গিয়ে প্রথম শিক্ষার্থীদের মন পীড়িত পিষ্ট হোতে থাকে, এবং তাদের শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটে। এই অনর্থক মানসিক ক্ষতি নিবারণ অত্যন্ত আবশ্যক ব'লে আমি মনে করি। জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটনের চেষ্টা পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল বহুপ্রচলিত। এই কর্তব্য সাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা কেবল যে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ তা নয় তাঁরা ভাষা ব্যবহারে নিপুণ। তাঁরা শিক্ষণীয় বিষয়কে যথোচিত সরল করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। দেশের চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সেচন ব্যাপারকে ব্যাপক ক'রে তোলা তাঁরা কত বড়ো সতর্ক সাধনার বিষয় ব'লে মনে করেন এর থেকে তার প্রমাণ হয়। আমাদের দেশে জনসাধারণ যেখানে বিজ্ঞানের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেখানে সহজ প্রণালীতে বিদ্যাদানের অধ্যবসায়কে আমি পুণ্য কর্ম ব'লে গণ্য করি। লোকশিক্ষাসংসদ এই কাজের ভার গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের চর্চা সহযোগে একান্তভাবে ইংরেজি ভাষার ব্যবহারেই দীক্ষিত তাঁদের পক্ষে এই জনহিতকর

সাহিত্য স্বদেশে প্রচার করা দুঃসাধ্য। এই জন্য যথেষ্ট লেখক পাওয়া দুর্লভ।

সৌভাগ্যক্রমে স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন এই গুরুভার গ্রহণ স্বীকার করেছেন। বাংলা ভাষা প্রয়োগে তাঁর নৈপুণ্য আছে নির্মমতা নেই। দুরূহ বাক্যজালজড়িত পাণ্ডিত্যের আঘাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষার বিষয়কে দুঃসহ ক'রে তোলা তাঁর পন্থা নয়। সেইজন্য লোকশিক্ষাদান সংকল্পকে সার্থক করার উদ্দেশে তাঁর সহায়তা পেয়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। এই শুভকার্যে তিনি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থকারের নিবেদন

বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু তথ্য আহরণ ক'রে শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-শিক্ষার ভূমিকা ক'রে দেবার অতিগুরুভার অর্পণ করেছেন 'গুরুদেব' আমাদের মতো অক্ষমের হাতে। সহজ সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলতে হবে, কিন্তু মাপা হাতার ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেশন তাতে চলবে না, এই হোলো আমার প্রতি তাঁর আদেশ। দুরূহ শব্দের আশ্রয় না নিয়ে, মনকে পীড়িত না ক'রে, কী ভাবে বিষয়বস্তু সরল করা যায় সেই শিক্ষা তাঁর হাতে পাবার অতিবড়ো সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই কাজে যদি কিছু-মাত্র সফল হয়ে থাকি তার কোনো কৃতিত্ব আমার নেই। এই বইখানি আগাগোড়া পড়ে, দরকার মতো ভাষা ও তথ্যের পরিবর্তন করতে গুরুদেব অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে এই বই লেখা অসম্ভব ছিল; তাঁর ঋণ স্বীকার করব এমন ভাষা আমার নেই। এই সামান্য কাজে তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

পৃথিবীর জন্মকথা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের যে-আলোচনা এখানে করেছি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তা একটু জটিল সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের সঙ্গে যাদের

প্রথম পরিচয় ঘটেছে তাদের কাছে এর বিষয়বস্তু সহজ হবে বলেই আশা করি। পৃথিবী-সৃষ্টি থেকে আরম্ভ ক'রে তার বর্তমান কলেবর গড়ে ওঠা পর্যন্ত যা-কিছু এর উপর ঘটেছে তার কিছুই আকস্মিক নয়, এর সমস্ত ব্যবস্থার মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক শক্তির একটা বিরাট শৃঙ্খলা। বিজ্ঞানসম্মত কারণ দিয়ে তা যথাসাধ্য সরল ক'রে বোঝাতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। কোনো কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই এমন আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকেই মানুষের বুদ্ধি মেনে নিতে চায় না। সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে বুদ্ধি দিয়েই সব কিছু যাচাই ক'রে নিতে হবে এই হোলো বিজ্ঞানশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থে গ্যাস কথার তর্জমায় বায়ব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়—"বাতি গচ্ছতি বায়ুঃ"—অর্থাৎ বায়ুর ধাতুগত অর্থ গতিশীল। গ্যাসের ধর্ম গমনশীলতা। সংস্কৃতে বাতাসের বহুবচনে ব্যবহার আছে অতএব বিচিত্র গ্যাসকে বায়ব পদার্থ এবং সংক্ষেপে বায়ব বলা অসংগত হয় না।

এই বইখানি লেখার সময় আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুদ্বয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন সেন এম. এ. পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন) ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ এম. এ. আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজ ও সরল ক'রে বুঝিয়ে বলার দক্ষতা তাঁদের অসাধারণ; এই কাজে তাঁদের ন্যায় অভিজ্ঞ বন্ধুর উপদেশ আমার কাছে

অতি দুর্লভ জিনিস। তাঁদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

বিশ্বভারতীর কর্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এসসি. (ইলিনয়) বইখানি পড়ে অনেক ভুল সংশোধন করেছেন। তাঁর কাছে এই সাহায্য ও অনেক অযাচিত উপদেশ পেয়ে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

Gheyselinck-এর The Restless Earth, Jeans-এর Through Space and Time এবং Marvels and Mysteries of Science এই তিনখানা বই থেকে এই বইয়ের ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

স্তরের পাথরের উপরে বা চারদিকে ভাঁজ হয়ে বৃত্তাংশের (arch) মতো দেখতে হয়।

এই তো গেল পৃথিবীর বহিস্তরের মোটামুটি খবর; এখন এর ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। পৃথিবীর ভিতরের খবর জানতে হোলে সেখানে আমাদের যেতে হবে, আর তা সম্ভব না হোলে এমন উপায় বের করতে হবে যার সাহায্যে উপরে বসেই ভিতরের খবর সব পাওয়া যাবে। কিন্তু ভিতরে গিয়ে পৃথিবীর অবস্থা জানতে হোলে মাটি কেটে নিচে যাওয়া দরকার। এ পর্যন্ত কয়লার খোঁজে যতদূর খনন করা হয়েছে তার গভীরতা এক মাইলের বেশি নয়। তেলের খোঁজে যে গর্ত করে পাইপ বসানো হয়েছে তার গভীরতাও ১৫০০০ ফুটের বেশি নয়। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল, এর কাছে এসব নিচু গর্ত এ যেন লেবুর উপর ছোটো ছুঁচের ছিদ্র যা পরীক্ষা করে লেবুর ভিতরের খবর কিছুই বলা চলে না। দেখা গেছে যে যত মাটির নিচে যাওয়া যায় উত্তাপও ততই বাড়তে থাকে। এখনও পৃথিবীর অভ্যন্তরে কত তেজ সঞ্চিত আছে তার আভাস পাওয়া যায় আগ্নেয়গিরির তরল ধাতু নিঃস্রবণ থেকে। পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় এসব ধাতুস্রাবের উৎসের গভীরতাও খুবই কম, কাজেই আরো নিচের খবর জানতে হোলে নূতন পথ ধরে কাজ করতে হবে। ভূমিকম্পের সাহায্যে পৃথিবীর উপরে বসেই ভিতরকার অনেক খবর বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। কী উপায়ে সম্ভব হয়েছে তার কথাই এখন বলব।

মাটির নিচে কোথাও কোনো আন্দোলনের সৃষ্টি হোলে সেখান থেকে ঢেউ উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, জলে ঢিল ফেললে যেমন করে আন্দোলনের স্থানকে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকার ঢেউ চারদিকে চলতে থাকে। সকলেরই একথা জানা আছে জলের ঢেউ কোথাও বাধা পেলে

তার গতি বদলে যায়, তেমনি নানা জিনিসের গায়ে ঠেকে ভূমিকম্পের ঢেউও গতি পরিবর্তন করে। পৃথিবীর বহিস্তরের ও অভ্যন্তরের পদার্থের ভিতর কোনো তফাত না থাকলে নিচে থেকে যেসব ঢেউ উপরে উঠে আসে তাদের গতির কোনো পরিবর্তন হোতে পারে না। আন্দোলন যত প্রবল হয় এই ঢেউ তত দূরে যায়। ছোটোখাটো ঢেউ বেশির ভাগ কিছুদূর এগিয়েই মিলিয়ে যায়, কিন্তু গভীর অভ্যন্তরে প্রবল আন্দোলন থেকে যেসব ঢেউ ওঠে তা সোজা নিচে চলে যায়, না হয় সোজা উপরে উঠে এসে মাটিতে কম্পনের সৃষ্টি করে। বহিস্তরকে দোলা দিয়ে সেই কম্পনের ঢেউ চলতে থাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।

শুধু অনুভব ক'রে ভূমিকম্পের বেগ স্থির করা অসম্ভব। Seismograph অর্থাৎ ভূকম্প-লিপি নামক একটা যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে; তার পটে এসব ঢেউ যে উঁচুনিচু চিহ্ন আঁকে তার থেকে তাদের বেগ স্থির করা যায়। প্রবল আন্দোলন আমরা অনুভব করতে পারি, কিন্তু যেসব ছোটো ঢেউ আমাদের অনুভূতিতে পৌঁছয় না তারা ধরা পড়ে এই যন্ত্রে। এই যন্ত্রের কথা খুব সোজা করে এখন কিছু বলা যাক। একটি বড়ো লাঠি মাটির নিচে অনেকদূর পোঁতা থাকে, তার দুপাশ থেকে দুটি লম্বা দোলক ঝুলানো থাকে। একটি দোলক উত্তর-দক্ষিণে দুলতে পারে, অপরটি দোলে পূর্ব-পশ্চিমে। দোলকের মাথায় একটি করে কলম লাগানো থাকে, কলম দুটি লেগে থাকে এক টুকরো চলন্ত কাগজের উপর। ভূমিকম্পে মাটি যখন কাঁপে তখন তার সঙ্গে মাটিতে পোঁতা ঐ বড়ো লাঠিও কাঁপতে থাকে; লাঠির সঙ্গে লাগানো থাকায় দোলক দুটিও দুলতে থাকে, আর কলম দুটি ঐ চলন্ত কাগজের উপর ক্রমাগত দাগ কেটে লিখে রেখে যায় দোলনের বেগ ও গতিমুখ। এই যন্ত্রে খুব সামান্য দোলা ধরতে হোলে দোলক দুটি যাতে খুব

সহজে দুলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হয়। অবশ্য এরূপ সূক্ষ্মভাবে ঝুলাবার একটু অসুবিধাও আছে। ভূমিকম্প ছাড়া ভারি গাড়ি বা অন্য কোনো কারণে মাটি নড়ে উঠলেও তার দোলা এই যন্ত্রে ধরা পড়বে, কাজেই কোন্ দোলা ভূকম্পের আর কোন্ দোলা স্থানীয় কারণে হয়েছে তা স্থির করতে অনেক সময় বেশ বেগ পেতে হয়। সমুদ্রে প্রবল ঝড়ের সময় প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে মাটি কেঁপে ওঠে, তার দোলা ধরা পড়ে বহুদূরবর্তী ভূকম্প-লিপি যন্ত্রে। আরব্য উপসাগরে ঝড় উঠলে ঢেউয়ের আঘাতে মাটির যে দোলা সৃষ্টি হয় তা ধরা পড়ে বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে কোলাবা মানমন্দিরের Seismograph যন্ত্রে; খবর পেয়ে সমুদ্রযাত্রী জাহাজ পূর্বাহ্নেই সতর্ক হোতে পারে।

মনে করা যাক দুই ভিন্ন জায়গায় দুটি যন্ত্র বসানো আছে; ভূমিকম্প হোলে এই দুটি যন্ত্রেই তার দোলা ধরা পড়ে, কিন্তু এক সময়ে নয়, কারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে এসব ঢেউয়ের কিছু সময় লাগে। স্থান দুটির দূরত্ব ও ভূকম্প আরম্ভ হওয়ার সময় জেনে পৃথিবীর উপরিতলে কঠিনস্তরের ভিতর দিয়ে কী পরিমাণ বেগে এই ঢেউ চলাচল করে তা সহজেই স্থির করা যায়। পৃথিবীর বহিস্তর ও অভ্যন্তরদেশ যদি একই পদার্থে গঠিত হোত তাহলে ভূমিকম্পের ঢেউ পৃথিবীর যেখান দিয়েই যাক না কেন তাদের গতিবেগের পরিমাণে কোনো তফাত থাকত না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় জানা গেছে যে মাটির অনেক নিচে যে-কম্পন সৃষ্টি হয় কঠিন স্তরের কম্পনের বেগের চেয়ে তার বেগ ঢের বেশি। পৃথিবীর উপরিতল থেকে যেসব স্থান সমান গভীর তাতে ঢেউয়ের গতিবেগের কোনো ভেদ দেখা যায় না। এই পরীক্ষা থেকে বলা চলে যে পৃথিবীর উপরের ও ভিতরের জিনিস ঠিক এক অবস্থায় নেই, কিন্তু মাটির সমান তলের পদার্থে অবস্থার কোনো প্রভেদ নেই।

ভূমিকম্পের ঢেউ তিন রকমের। প্রাথম (Primary) ও দ্বৈতীয় (Secondary) এই দুই রকমের ঢেউ পৃথিবীর অভ্যন্তরে চলাচল করে, আর অন্যরকমের ঢেউ (Surface waves) বহিস্তরের উপর দিয়ে যায়। সব ঢেউয়েরই উৎপত্তি এক জায়গায়। প্রাথম ঢেউয়ের বিশেষত্ব এই যে-বস্তুপদার্থকে দোলা দিয়ে এরা চলে তার দোলন ও এদের গতি ঠিক একই দিকে। দ্বৈতীয় ঢেউয়ের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম। যদিও এই দুই প্রকারের ঢেউ একই পথে চলে কিন্তু এদের চলার ভঙ্গীতে একটু তফাত আছে; দ্বৈতীয় ঢেউয়ে বস্তুপদার্থের দোলন ও ঢেউয়ের অগ্রগতির দিক পরস্পর এক সমকোণে অবস্থিত। প্রাথম ও দ্বৈতীয় ঢেউয়ের চলন বেগের বিভিন্নতা থাকায় উৎপত্তি কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের একই স্থানে পৌঁছতে এদের সময়ের ভেদ ঘটে; এই সময়ভেদের পরিমাণ থেকে স্থির করা সহজ হয় আন্দোলনের কেন্দ্র। প্রাথম ঢেউ যে-কোনো পদার্থের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারে কিন্তু দ্বৈতীয় ঢেউকে তরল ও বায়ব পদার্থ আটক করে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে, দ্বৈতীয় ঢেউ পৃথিবীর উপর থেকে কখনো দুহাজার মাইলের বেশি নিচে যেতে পারে না। কাজেই বলতে হবে যে, ২০০০ মাইলের নিচে পৃথিবীতে কোনো কঠিন জিনিস নেই, থাকলে এসব ঢেউ বিনা বাধায় সেখান দিয়ে চলতে পারত। ২০০০ মাইলের নিচে যে পদার্থ আছে তা খুব সম্ভব তরল বা বায়ব অবস্থায় আছে। সাধারণত যেসব তরল ও বায়ব জিনিসের সঙ্গে আমরা পরিচিত, পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশের পদার্থের সঙ্গে তাদের প্রভেদ থাকা সম্ভব; কারণ এত নিচে প্রতি বর্গইঞ্চিতে পৃথিবীর চাপ দুলক্ষ মোনেরও উপরে। এই বিরাট চাপে পদার্থের যে কী অবস্থা হোতে পারে তা কল্পনা করা যায় না।

কখন ভূমিকম্প হবে তা আগে থেকে জানবার আজও কোনো উপায় স্থির হয়নি। তবে যে-ধরনের সব আশ্চর্য তথ্য বিজ্ঞানীরা জড়ো করছেন তাতে ভরসা হয় অচিরেই এর একটা কিনারা হবে। বহুকাল ধরে পৃথিবীর ভূমিকম্পের হিসেব রাখা হচ্ছে, এদের সংখ্যা ও আন্দোলনের প্রাবল্য আমাদের জানা কোনো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে কিনা তা স্থির করার ক্রমাগত চেষ্টা চলছে। পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় ৪০০০ ভূমিকম্প হয়, প্রত্যেক ষাটটির মধ্যে একটি মাত্র Seismograph যন্ত্রে ভালোভাবে ধরা যায় আর বাকি বেশির ভাগই কম্পনের মৃদুতা বশত কোনো নির্ভরযোগ্য রেখাপাত করে না। ইটালি ও জাপানের মতো ভূমিকম্প-প্রধান দেশেও প্রত্যেক কুড়িটি ভূমিকম্পের মধ্যে দুটি মাত্রের আন্দোলনের তীব্রতা খুব বেশি। প্রলয়ংকর ভূমিকম্প জোট বেঁধে আসে কয়েক বছর পর পর; জাপানে তেরো বছর পর পর ধ্বংসকারী প্রবল ভূকম্প অনুভূত হয়।

কী করে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় তার কারণ নিশ্চিত বলা যায় না; অনেক শক্তির সমন্বয় রয়েছে এই আন্দোলনের মূলে। কেন যে শীতকালের মাঝামাঝি ভূমিকম্প হয় বেশি, আর কেনই বা চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী এক লাইনে থাকলে এই আন্দোলনের সংখ্যা ও তীব্রতা বেড়ে ওঠে তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। লাটিমের মতো পাক খেয়ে পৃথিবী সূর্যপ্রদক্ষিণ করে ব'লে তার মেরুদণ্ড সর্বদাই দিক পরিবর্তন করে; অনেকে বলেন মেরুদণ্ডের এইভাবে স্থান পরিবর্তন করার ফলে পৃথিবীর বস্তুপদার্থের মধ্যে একটা নাড়াচাড়া হয়, তাতেই আন্দোলনের সৃষ্টি হয়ে দোলা দিয়ে যায় পৃথিবীকে। একা যে-কোনো একটি কারণ সম্ভবত ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু পৃথিবীর কোনো অংশে যদি সাম্যস্থিতি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় তাহলে হাওয়ার

বর্ধিত চাপ, চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ, ও মেরুদণ্ডের স্থান পরিবর্তনজনিত বস্তুপুঞ্জের নাড়াচাড়া, এই তিন শক্তির সম্মিলিত আঘাতে সাম্যস্থিতির অবসান ঘটে; প্রবল আন্দোলন ওঠে জেগে।

মাটির নিচে যে কী অগ্নিকাণ্ড চলেছে তার আরো একটু আলোচনা করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। যত মাটির নিচে যাওয়া যায় উত্তাপও ততই বাড়তে থাকে একথা বলা হয়েছে। এই উত্তাপবৃদ্ধির মাত্রা পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। Leipzig শহরের কাছে কয়লার খোঁজে মাটি কেটে যে গর্ত করা হয়েছিল তার ভিতর থার্মমিটর নামিয়ে জানা গেছে যে একমাইল নিচে উত্তাপ উপরিতলের চেয়ে ৮০° ডিগ্রি বেশি, আর ৬৬ ফুট করে নিচে নামলে উত্তাপও একডিগ্রি করে বাড়তে থাকে। Californiaতে প্রত্যেক ২৫ ফুটে উত্তাপবৃদ্ধির মাত্রা এক ডিগ্রি, আর Wyomingএ প্রতি ২২ ফুটে ১০° ডিগ্রি করে উত্তাপ বাড়তে থাকে; এই বৃদ্ধির হার এত বেশি যে মাত্র ৩৫০ ফুট নিচে গেলে সেখানকার উত্তাপে জল ফুটতে আরম্ভ করবে। এই কারণেই এই প্রদেশে অবস্থিত Yellowstone Parkএ এত বেশি উষ্ণপ্রস্রবণ (Geyser) ও উষ্ণউৎস (Hot Spring) দেখতে পাওয়া যায়। এদের তাপের মূলে রয়েছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত তেজ। যেসব জায়গায় সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে বা যেখানে আগ্নেয় উৎপাতে পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে সেসব জায়গাতেই উষ্ণউৎস বেশি দেখতে পাওয়া যায়। Yellowstone Parkএ এদের সংখ্যা ৩০০০র বেশি। মাটির নিচে থেকে উত্তপ্ত জল চাপের ঠেলায় কোনো গর্ত দিয়ে বহুঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত হোলে উষ্ণপ্রস্রবণের সৃষ্টি করে। New Zealand, Yellowstone Park ও Icelandএ এদের সংখ্যা বেশি। প্রত্যেক বর্গমাইলে প্রায় পঞ্চাশটি করে রয়েছে। অধিকাংশ উষ্ণপ্রস্রবণ থেকে

থেকে সক্রিয় হয়। মাটির নিচে অনেক ফাঁকা জায়গা আছে যেখানকার তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে বেশি; ঐ স্থানে কিছু জল গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা বাষ্পে পরিণত হয়। আরো জল যখন ঐ জায়গায় প্রবেশ করে তখন আবদ্ধ বাষ্পের প্রবল চাপে ঐ জল ভূপৃষ্ঠের কোনো ফাটল বা গর্ত দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত হয় বহুঊর্ধ্বে। আবার ঐ ফাঁকা জায়গায় জল ঢুকে বাষ্পে পরিণত হোতে যে-সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রস্রবণ নিষ্ক্রিয় থাকে। New Zealandর Pohutu উষ্ণপ্রস্রবণই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো; এর ভিতর থেকে গরম জল ৫০০ ফুট থেকে ১৫০০ ফুট পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। Yellowstone Parkএ শতাধিক সক্রিয় উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাদের মধ্যে Old Faithfulর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর ভিতর থেকে আজ একটানা ত্রিশবছর ধরে ৮০ মিনিট অন্তর গরমজল ও বাষ্প ১৫০ ফুট ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। যে চারমিনিট কাল এই প্রস্রবণ সক্রিয় থাকে তাতে এর ভিতর থেকে প্রায় ২ লক্ষ মোন গরম জল বের হয়ে আসে।

আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণপ্রস্রবণের ভিতর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, তপ্তজলের বদলে আগ্নেয়গিরি থেকে বের হয় ধাতুস্রাব, ছাই ও বাষ্প। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যখন আবদ্ধ তেজের চাপ অতিমাত্রায় বেড়ে ওঠে তখন তার প্রবল আঘাতে ভূপৃষ্ঠের গর্ত দিয়ে গলন্ত বস্তুপদার্থ প্রচণ্ড বেগে ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়; ঐ অতিরিক্ত চাপের অবসান হোলে আবার আগ্নেয়গিরি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর ভিতরকার অগ্নিকাণ্ডের অতি সামান্যই প্রকাশ পায় এসব প্রাকৃতিক উৎপাতের মধ্য দিয়ে। কী বিরাট আগুনের কারখানাকে ঘিরে রয়েছে এক ক্ষুদ্র কঠিন আবরণ, বাইরের শান্তভাব দেখে তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনে প্রাকৃতিক শক্তির কাজ

পৃথিবীর উপর যেসব উঁচু নিচু জায়গার সৃষ্টি হয়েছিল তাদের ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে নানা কারণে। আকস্মিক ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে অনেক জায়গায় অনেক পরিবর্তন ঘটে। আগ্নেয়গিরি থেকে প্রথমে বেরোয় জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য উত্তপ্ত বাষ্প; অনেক সময় এত বেগে বাষ্পপুঞ্জ প্রক্ষিপ্ত হয় যে মাটি থেকে কয়েকমাইল উপরে উঠে যায়। খুব বড়ো বড়ো পাথরের টুকরোও এই সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এর পরে উত্তপ্ত তরল পদার্থ ক্রমাগত নিঃসৃত হয়ে যে জায়গা দিয়ে বয়ে যায় তা ধ্বংস করতে থাকে। য়ুরোপের সবচেয়ে বড়ো আগ্নেয়গিরির নাম ভিসুভিয়স; ইটালির নেপল্‌স উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ৭৯ খ্রীস্টাব্দে এরই প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের ফলে Pompeii নগরী গলন্ত ধাতু-স্রাবের নিচে চাপা পড়ে, Herculaneum ও Stabiae নগরীও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। অনুমান দুই লক্ষ লোক এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণ হারায়। তারপর প্রায় ১৫০০ বছর পর্যন্ত নিক্রিয় থেকে ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে আবার এক প্রলয়ংকর অগ্নিউদ্‌গার ক'রে ১৮০০০ লোকের প্রাণনাশের কারণ হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এর ভিতর একটা সক্রিয়তা চলে আসছে কিন্তু এই ধরনের ধ্বংসকারী অগ্ন্যুৎপাত আর ঘটেনি। শুধু ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নিকটবর্তী দুইটি গ্রাম ছাইচাপা পড়েছিল। এর ভিতর নাকি এখন এমন একটা

গ্রীনল্যাণ্ডের বরফের নদী

[পৃ. ২৯

কলোরেডোর 'ক্যানিয়ন' [পৃ. ২৭

অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে যার থেকে অনেকেই সন্দেহ করছেন যে অচিরেই একটা প্রবল অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে।

জাভার কাছে Krakatoa নামে ছোটো একটি দ্বীপ ছিল; ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের আগে এর নাম অনেকেই জানতেন না। ঐ সময়ে কিছুদিন ধরে এই দ্বীপের মধ্যে আগ্নেয়গিরির বেগ কিছু কিছু দেখা যায়; তারপর হঠাৎ একদিন সকালে, প্রচণ্ড এক দোলা দিয়ে, ভয়ানক এক আওয়াজ করে সমস্ত দ্বীপটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল। ভাঙার জোরে প্রায় এক ঘনমাইলব্যাপী পাহাড়ের একটা প্রকাণ্ড অংশ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে এসে পড়ে যে বিরাট ঢেউ তুললে তাতে সুমাত্রা ও জাভার উপকূলে আন্দাজ ৩৬০০০ লোক মারা পড়েছিল। ১৬৩ খানা গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। অগ্ন্যুৎপাতে সমুদ্রের জল এত গরম হয়েছিল যে গভীর জলের বড়ো বড়ো মাছ কূলে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই দ্বীপ ভাঙার সময় যে ভয়ানক শব্দ হয়েছিল ৩০০০ মাইল দূরে থেকেও তা লোকে শুনতে পেয়েছে। কী বিরাট শক্তি এই অগ্ন্যুৎপাতের যার বলে পাহাড় গুঁড়িয়ে তার ধুলো আকাশে ২০ মাইল উপরে তুলে দিয়েছিল। এত অপর্যাপ্ত ধুলোয় চারদিক আচ্ছন্ন হয়েছিল যে Krakatoa থেকে ১০০ মাইল দূরেও দিন রাত্রির কোনো ভেদ বোঝা যেত না। এই দ্বীপ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর প্রায় দু-বছর পর্যন্ত এই ধুলো আকাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। সূর্যের আলো এই ধুলো থেকে ছড়িয়ে প'ড়ে সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে আকাশে নানা রঙের সৃষ্টি করত। নিউজিলাণ্ডের Hawkes Bayতে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে প্রবল ভূমিকম্প হয় তার অতর্কিত প্রচণ্ড আঘাতে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই Napier শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই দুর্ঘটনায় শত শত লোক প্রাণ হারায়। ১৯৩৭ সালের ৩০মে ভালকান ও মেটুপী দ্বীপের

আগ্নেয় উৎপাতে নিউ ব্রিটেনের রাজধানী রবাউল নগরীর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে ; একটি পুরোনো দ্বীপ নষ্ট করে নূতন আর-একটি দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। ১৯৩৮ সালে এপ্রিল মাসে আনাতোলিয়াতে যে প্রলয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ ; প্রায় এক ঘণ্টাকাল ধরে চলেছিল এর আন্দোলন। খাদির ও ভিয়োজগাদ নামক শহর দুটির চারপাশে ১৮টি গ্রাম ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, আরো ২২টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। কত লোক যে হত ও নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে তার সঠিক খবর জানা যায়নি। অনুমান ৫০ হাজার নরনারী আশ্রয়হীন হয়েছে। বিহার ও কোয়েটার ভূমিকম্পের ধ্বংসকার্যের স্মৃতি ভারতবাসীর মনে আজও আতঙ্কের সঞ্চার করে।

হাওয়া, জল ও বরফের আক্রমণে ক্ষয়ে যায় পৃথিবীর আবরণ। সূর্যের তাপে সমুদ্র ও নদী থেকে জল বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে, সেখানে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে বাষ্প জমে গিয়ে জলের কণা সৃষ্টি করে, তারপর পৃথিবীর টানে নেমে আসে মাটির উপর বৃষ্টির ধারা রূপে। এই বৃষ্টির জল উঁচু জায়গা থেকে নিচে সমুদ্রের দিকে নেমে আসে, প্রবল স্রোতের বেগ মাটি কেটে রাস্তা করে নেয়। চারদিক থেকে আরো অনেক জলের ধারা এসে যোগ দেয় তার সঙ্গে, নদীর সৃষ্টি হোতে থাকে। এই জলের স্রোত ঠেলে নিয়ে চলে পাথরের টুকরো ও বালুকণা ; এদের নিরন্তর আঘাতে মাটি আরো ভেঙে যায়, তাই নদী ক্রমশ চওড়া ও গভীর হোতে থাকে। ছোটো ছোটো নদী এসে এক সঙ্গে মেলে, তার সঙ্গে ঝরনার জলও যোগ দেয়, তার থেকে সৃষ্টি হয় বড়ো বড়ো নদীর। নদী যতই সমুদ্রের কাছে আসে তার বেগও ততই কমে যায়। যে মাটি, পাথর ও বালুকণা জলস্রোতের সঙ্গে আসে সেসব জমা হোতে থাকে নদীর মোহানায় ; অনেকদিন ধরে জ'মে জলের উপর জেগে ওঠে। এক

জায়গার জিনিস ভেঙে জড়ো হয় অন্য জায়গায়। নদী যেখানে খুব খাড়া পথ দিয়ে যায় জলের স্রোত সেখানে এত বাড়ে যে বড়ো বড়ো পাথর ঠেলে নিয়ে চলে। জলপ্লাবনের সময় ছোটো নদীতেও জলস্রোতের বেগে পাহাড় থেকে বড়ো বড়ো পাথরের অংশ ভেঙে পড়ে; অনেক সময় দেখা যায় যে ৪০।৫০ মোন ওজনের পাথরও এই স্রোত ঠেলে নিয়ে চলে। জলের নিচেকার উঁচু জায়গা এত বড়ো বড়ো পাথরের ধাক্কায় ভেঙে গিয়ে সমান হয়ে যায়। এমনি করেই জলের স্রোত পৃথিবীর উপর পরিবর্তন সাধন করে। এই স্রোতের ঠেলায় মাটি যে কী পরিমাণ ক্ষয়ে যেতে পারে তা বোঝা যায় উত্তর আমেরিকার কলোরেডো নদীর অবস্থা দেখলে। ক্রমাগত এক জায়গা দিয়ে জল যাওয়ার ফলে পাহাড় সেখানে এতদূর ক্ষয়ে গেছে যে কোনো কোনো জায়গায় একমাইলেরও বেশি গর্ত হয়েছে; দুই দিকে পাহাড়ের উঁচু দেয়াল আর মাঝখানে প্রায় একমাইল নিচে দিয়ে নদীর জলস্রোত। এরকম অপূর্ব দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও নেই। পাহাড় ক্ষয় ক'রে জল সোজা নিচের দিকে গর্ত করে গেছে, তাই নদী সেখানে বেশি চওড়া হোতে পারেনি। বৃষ্টি এসব জায়গায় কম হয় ব'লে নদীর ধারে পাহাড় এখনও সোজা দেওয়ালের মতো উঁচু হয়ে আছে; বেশি বৃষ্টি হোলে জলের স্রোতে পাহাড় ক্ষয়ে গিয়ে এর চেহারা সাধারণ নদীর মতো হোত, এই বিশেষত্ব আর থাকত না।

জল ও স্থলে ভাগ হওয়ার পরে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর ভূমিঅংশ ক্রমাগত ক্ষয় হোতে থাকে। হাওয়ার অক্সিজেন ও কার্বনিক এ্যাসিডের আক্রমণে কঠিন পাথরের ঠাসা বস্তুপদার্থ যায় অনেক আলগা হয়ে। বৃষ্টির জলে এই পাথর তখন সিক্ত হোলে তার অধিকাংশ ভারি পদার্থ গ'লে যায়, তারপরে জলস্রোতের সঙ্গে নদীতে গিয়ে পড়ে, তারপর

যায় সমুদ্রে। হালকা যেসব জিনিস গলে না তা মাটির উপরেই থেকে যায়। হাওয়া ও জলের এই ভাবে কিছুদিন সংঘর্ষ চললে ভূমিঅংশ হালকা হয়ে আসে, আর সমুদ্রে গিয়ে জড়ো হয় ভারি জিনিস। এই ভারি পদার্থের কিছু অংশ জলের সঙ্গে মিশে থাকে, কিন্তু বেশির ভাগই জমা হয় সমুদ্রের তলদেশে কঠিন আকারে। এই উপায়ে ভূমিঅংশ থেকে পদার্থ ক্রমাগত সমুদ্রের নিচে গিয়ে জমা হয়, উঁচু স্থান ক্ষয়ে গিয়ে নিচু হোতে থাকে। বিনা বাধায় এই কাজ চললে আস্তে আস্তে ভূমিঅংশ এত নিচু হোত যে সমুদ্রের জলে সমগ্র স্থলভাগ ঢাকা পড়ত, গাছপালা, জীবজন্তু সব মারা যেত, মানুষের চিহ্ন লুপ্ত হোত পৃথিবী থেকে। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে ভারি পদার্থ ক্রমাগত জ'মে এক বিরাট চাপের সৃষ্টি করে, তার ফলে নিচে নেমে যায় ঐ স্থান, অন্য এক স্থান উঁচু হয়ে ওঠে উপরে। এ ভাবেই জল ও স্থলের একটা সাম্যস্থিতি রয়েছে। এই পদার্থের চাপ সামনের দিকে পাশাপাশি ভাবেও অনেক সময় কাজ করে, ফলে অনেক উঁচু নিচু জায়গার উৎপত্তি হয়। কী ক'রে এরূপ হয় তা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ঘরের মেঝেতে পাতা একটি কার্পেট বা শতরঞ্চকে সামনের দিকে ঠেলা দিলে তা কুঁচকে যাবে, জোরে ঠেলা দিলে ঐ কুঁচকানো কার্পেটের একটি ভাঁজ অন্য ভাঁজের উপরে পড়বে। ঠিক এ ভাবেই সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত পদার্থের চাপে মাটি ভাঁজ ভাঁজ হয়ে পৃথিবীতে অনেকগুলো পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে এ ভাবের সরাসরি চাপের ফলেই হিমালয় ও আল্‌পস্ পর্বতের উৎপত্তি। সামনের প্রচণ্ড চাপে এসব পর্বত কুঁচকে গিয়ে ভাঁজ ভাঁজ হয়েছে, উপরকার ভাঁজ নিচেকার ভাঁজের উপর থেকে সরে গিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। হিমালয়ের পাথরে অনেক সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া গেছে; এদের পরীক্ষায় স্থির হয়েছে হিমালয়

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনে প্রাকৃতিক শক্তির কাজ

পর্বত একদিন সমুদ্রের নিচে ছিল। সামনের চাপে মাটি ভাঁজ ক'রে যে কতদূর উপরে তুলে দিতে পারে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাহাড়, পর্বত, সমতলভূমি, আগ্নেয়গিরি এদের উৎপত্তি আকস্মিক নয়, এদের সৃষ্টির মূলে প্রাকৃতিক শক্তির একটা বিরাট শৃঙ্খলা রয়েছে; একদিকে ভূমিঅংশ যেমন ক্ষয় হচ্ছে, অন্যদিকে তার আবার পূরণ হচ্ছে। জলের আক্রমণ থেকে যা বাঁচে তা ভেঙে পড়ে বরফের আঘাতে। কোনো পাহাড়ের ভিতর জল আবদ্ধ হোলে তা ঠাণ্ডায় জ'মে বরফ হওয়ার সময় আয়তনে অনেকটা বেড়ে যায়, তাতে এমন প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় যার আঘাতে খুব শক্ত পাহাড়ও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই বরফ যখন গলতে থাকে তখন পাহাড়-ভাঙা টুকরোগুলো সেই জলের সঙ্গে গড়িয়ে নিচে নেমে আসে।

মাটি থেকে উপরে উঠলে হাওয়ার উত্তাপ কমতে থাকে, অনেকটা উপরে উঠলে হাওয়া এত ঠাণ্ডা হয় যে জলের বিন্দু জমে বরফ হয়ে যায়। পাহাড় যদি খুব উঁচু হয় তাহলে তার চূড়ায় জল জ'মে চিরকাল বরফ আকারে থাকতে পারে। দিনের পর দিন এখানে বরফ জমা হোতে থাকে, বেশি জমা হোলে তার কিছু অংশ ভেঙে পড়ে, চূড়া থেকে বেগে নেমে আসে উপত্যকায়। এখানে এসে খুব আস্তে আস্তে নামতে থাকে, কঠিন এক বরফের নদী বয়ে চলে উপত্যকার ভিতর দিয়ে। স্থান ও সময় বিশেষে এই বরফের নদীর বেগ বিভিন্ন হয়; আল্‌পস্‌ পর্বতে এদের গতি দিনে এক ফুটের বেশি হোতে দেখা যায় না। মেরুপ্রদেশে কিন্তু গতি একটু বেশি, গ্রীনল্যাণ্ডের কোনো কোনো বরফের নদীর বেগ দিনে ৫০ ফুট পর্যন্ত হোতে দেখা গেছে। এই বরফের নদীও অনেক সময় পাহাড় থেকে ছোটো বড়ো অনেক পাথরের টুকরো ভেঙে নিয়ে চলে। ছোটো টুকরোগুলোর আঘাতে পাহাড় অনেকটা সমতল হয়ে

আসে, আর বড়ো টুকরোগুলো প্রকাণ্ড দাগ কেটে যায় পাহাড়ের গায়ে। এই রকমের দাগ দেখলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কোনো এক সময়ে এই জায়গা দিয়ে বরফের নদী বয়ে গিয়েছিল। সুইট্জারল্যাণ্ডের অনেক উপত্যকায় এখনও এই বরফের আক্রমণের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন উত্তর আমেরিকায় বহুকাল আগে এক বরফের নদী ছিল যার চিহ্ন এখনও আছে। পাথরের আঘাতে যেসব বড়ো বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল আজ সেসব জলে ভরতি হয়ে অসংখ্য হ্রদের আকারে ছড়িয়ে আছে। এইজন্য অন্য দেশের তুলনায় উত্তর আমেরিকাতে হ্রদের সংখ্যা এত বেশি।

হাওয়ার প্রভাবেও পৃথিবীর উপর অনেক পরিবর্তন হয়। প্রচণ্ড ঝড়ে বড়ো বড়ো গাছ উপড়ে ফেলে, পাথরের টুকরো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। বালুকণা হাওয়ায় তাড়িত হয়ে এসে পাহাড়ের গায়ে ক্রমাগত আঘাত করে, এই নিরন্তর আঘাতে ধীরে ধীরে ঐ পাহাড় ক্ষয়ে যায়। নরম জায়গা ক্ষয় হয় খুব সহজে, এসব পাহাড়ও তাই অনেক সময় দেখতে হয় খুব অদ্ভুত। সমুদ্রের তীর বা কোনো মরুভূমি থেকে বালুকণা হাওয়ায় তাড়িত হয়ে এক জায়গায় জমা হয়, বড়ো বড়ো এক-একটা বালুর স্তূপ সৃষ্টি করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান হ্রদের তীরে এসব স্তূপ প্রায় দুশো ফুট উঁচু হয়ে আছে। হাওয়ার আঘাতে সমুদ্রের জলে ঢেউ ওঠে; বড়ো বড়ো ঢেউ তীরে উঠে আসার সময় পাথরের টুকরো সঙ্গে নিয়ে আসে। ঢেউ যখন ভেঙে পড়ে বা নেমে যায় তখন এগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর নেমে আসে। ক্রমাগত ওঠা নামা করাতে পাথরের টুকরোগুলো পরস্পর ধাক্কা খেয়ে ক্ষয়ে যেতে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ছোটো হোতে হোতে বালুকণায় পরিণত হয়। ঢেউয়ের আঘাতে সমুদ্রের

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনে প্রাকৃতিক শক্তির কাজ

তীরবর্তী পাহাড় থেকে বড়ো বড়ো পাথরের টুকরো ভেঙে গিয়ে জলের মধ্যে পড়ে; প্রত্যেক ঢেউ তীরে ওঠার সময় সঙ্গে নিয়ে চলে এসব পাথরের টুকরো। এদের অবিশ্রাম আঘাতে খুব শক্ত পাহাড়ও শেষে ভেঙে পড়ে।

বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীর চারদিক ঘিরে হাওয়ার একটি অদৃশ্য আবরণ আছে। কতকগুলি স্বচ্ছ গ্যাস মিশে সৃষ্টি হয়েছে হাওয়া—নাইট্রোজেন (শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ), অক্সিজেন (শতকরা প্রায় ২০ ভাগ), জলীয় বাষ্প, কার্বনিক এ্যাসিড, আরগন, নিয়ন, হিলিয়াম, জেনোন, ও ক্রিপটন এসব গ্যাসীয় পদার্থই হাওয়ার উপাদান। জলীয় বাষ্প ও কার্বনিক এ্যাসিড ছাড়া বাকি সবই মৌলিক জিনিস। পৃথিবী রচনার কয়েকটা মসলা আছে খাঁটি, কয়েকটা মিশোল; এই খাঁটি পদার্থগুলিই মৌলিক, আর যেগুলো দুই বা ততোধিক পদার্থের যোগে একটা রূপ নিয়েছে তাদের বলা হয় যৌগিক। সোনাটা মৌলিক, তাতে সোনা ছাড়া আর কিছুই নেই; জলকে বলা হয় যৌগিক, তার মধ্যে দুটো মূল পদার্থ আছে, যথা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস। যথা পরিমাণে এই দুটো গ্যাস একত্রে মিললে জল হয়ে যায়; অথচ এই দুটো গ্যাসের যা ধর্ম এদের মিলনজাত জলের ধর্ম তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যৌগিক পদার্থ-মাত্রেরই গুণ এই যে যাদের মিলনে তার সৃষ্টি তাদের থেকে তার ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সোডিয়ম নামে একটি মৌলিক ধাতু ও ক্লোরিন নামে একটি বিষাক্ত মৌলিক গ্যাস আছে; সোডিয়মকে জলে ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়। অথচ এই সোডিয়ম ও ক্লোরিনের ভিতর যখন মিলন ঘটে তখন এমন একটি নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয় যার ধর্ম এর মূল উপকরণের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই নূতন জিনিসকেই বলি নুন। হাওয়ার উপকরণ ব'লে যেসব জিনিসের নাম করা হোলো এরা সব হাওয়ার ভিতর একত্রে আছে, অর্থাৎ মিশেছে

কিন্তু এক হয়ে যায়নি। এদের প্রত্যেকের গুণ আলাদা দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণত আমরা ব'লে থাকি হাওয়ার মতো হালকা, কিন্তু বেশ বড়ো বড়ো ডানা-ওয়ালা পাখিকে শুধু ডানা ছড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন হাওয়ার উপর ভেসে বেড়াতে দেখি তখন বুঝতে পারি পাখিকে পড়ে যেতে বাধা দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে বাতাসের। বস্তুত কঠিন ও তরল জিনিসের মতো হাওয়ারও ওজন আছে। একফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া জিনিসের উপর হাওয়ার চাপ প্রায় সাতাশ মোন। এক জন সাধারণ মানুষের শরীরে চাপ পড়ে প্রায় ৪০০ মোনের উপর; দিনরাত এই বিরাট চাপে থাকা সত্ত্বেও আমরা তা টের পাই না। উপর থেকে নিচে থেকে, আবার আমাদের দেহের ভিতরে যে হাওয়া আছে তার থেকে, সমান ভাবে হাওয়ার চাপ ও ঠেলা লাগছে ব'লে এর ভার সইতে কষ্টবোধ হয় না। তা ছাড়া জন্মাবধি এই চাপেই গড়ে উঠেছে আমাদের শরীর, তাই এর চাপ অনুভব করিনে। এর ভারের বোধ তখনই জন্মায় যখন এমন কোনো জায়গায় যাই যেখানে চাপ এর চেয়ে বেশি বা কম। সমুদ্রে গভীর জলের নিচে গেলে হাওয়ার চাপের সঙ্গে জলের চাপও পড়ে, শরীরে তখন স্বচ্ছন্দে রক্তচলাচল হয় না তা বেশ অনুভব করা যায়। আবার বেলুনে চ'ড়ে পৃথিবীর অনেক উপরে যদি ওঠা যায়, হাওয়ার পরিমাণ সেখানে অনেক কম ব'লে শরীরে চাপ পড়ে খুবই কম; রক্ত চলাচলের গতি বেড়ে গিয়ে নাক, মুখ, চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্তের ধারা।

পৃথিবীর গায়ে হাওয়ার চাদর থাকায় তা দিনের বেলায় সূর্যের প্রচণ্ড তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আর রাত্রিতে শূন্য আকাশের প্রবল ঠাণ্ডাটাকে বাধা দিয়ে সৃষ্টি রক্ষা করে। হাওয়া না থাকলে সমস্ত পৃথিবী

হোত নিস্তব্ধ, কারণ শব্দের বাহন হচ্ছে হাওয়া। শব্দ ঢেউ খেলিয়ে চলে আসে হাওয়ার ভিতর দিয়ে, আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা পর্দায় আঘাত ক'রে এই শব্দের অনুভূতি জন্মায়।

সূর্যের যে-আলো আকাশ পেরিয়ে এসে আমাদের চোখে পড়ে তার ভিতর অনেক রং মিশে আছে। হাওয়ার ভিতর দিয়ে আসার সময় হাওয়ার অণু আলোর ছোটো ছোটো ঢেউগুলিকেই বেশি ছড়িয়ে দেয়। জলে যখন এক টুকরো সোলা ও বেশ বড়ো এক টুকরো ভারি কাঠ ভাসতে থাকে তখন দেখা যায় জলের ছোটো ছোটো ঢেউ হালকা সোলার টুকরোকেই দোলা দেয় বেশি, ভারি কাঠের টুকরোকে নাড়াতেই পারে না। ঠিক তেমনি আলোর ছোটো ঢেউ বেশি দোলা দেয় হাওয়ার অণু ও তাতে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণাকে, তাই এই ঢেউগুলিই চারদিকে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। উজ্জ্বল পদার্থ থেকে একটা ঢেউয়ের বেগ এসে আমাদের চোখে আঘাত করলে আমরা আলো অনুভব করি, এই ঢেউয়ের দৈর্ঘ্যের উপর আলোর রং নির্ভর করে; লাল রঙের বোধ জন্মায় যে-ঢেউ তা সকলের চেয়ে দীর্ঘ, আর তার চেয়ে খর্ব হচ্ছে নীল রঙের ঢেউ। সূর্যের ছড়ানো আলোর এই ছোটো ঢেউগুলি আমাদের চোখে এসে আঘাত করলে তার বোধকেই আমরা নীল আলো ব'লে জানি, তাই আকাশের রং দেখি নীল। সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে সূর্যকে দেখায় লাল, তার কারণ দিকসীমানার ধারে যখন সূর্য থাকে তখন খুব কম আলো আসে আমাদের কাছে, আর তাকে আসতে হয় অনেক বেশি হাওয়া পার হয়ে; এই স্বল্প আলো থেকে বেশির ভাগ ছোটো ঢেউ হাওয়ার অণু ও ভাসমান বস্তুকণার আঘাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, বড়ো বড়ো ঢেউগুলো বিশেষ বাধা না পেয়ে সোজা এসে চোখে পড়ে। এই সব দীর্ঘ ঢেউয়ের অনুভূতিই আমাদের চোখে

লাল আলো ব'লে ধরা দেয়। হাওয়া না থাকলে সূর্যের আলো ছড়াতে পারত না, তাই অতি তীব্র আলো ও গভীর অন্ধকারের তীক্ষ্ণ রেখায় পৃথিবী বিভক্ত হোত, দিনের আলো ব'লে কিছু থাকত না, দুপুর বেলাও আকাশ হোত অন্ধকার রাত্রির মতো ঘোর কালো। যেখানে সোজাসুজি সূর্যের আলো যেতে পারে না সেখানে আলো ছড়িয়ে দেয় হাওয়া, নইলে দিনের বেলায় ঘরের ভিতর আলো আসত কী ক'রে।

সমস্ত বায়ুমণ্ডল সিক্ত হয়ে আছে স্বচ্ছ জলীয় বাষ্পে, পৃথিবীর উত্তাপ সংরক্ষণে এই বাষ্পের প্রভাবও খুবই বেশি। হাওয়ার ভিতর যে কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস আছে তা সৃষ্টি হয়েছে কয়লা ও অক্সিজেনের যোগে। কাঠ যখন জ্বলতে থাকে তখন তার ভিতরকার অঙ্গার পদার্থ অর্থাৎ কয়লা হাওয়ার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বচ্ছ কার্বনিক গ্যাসের সৃষ্টি করে, এই মিলনে প্রচণ্ড তেজের উৎপত্তি হয়। এই গ্যাস হাওয়ার চেয়ে ভারি, নিশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে টেনে নিলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে আমাদের ভিতরে জ্বলছে অদৃশ্য আগুন, এই দহনই প্রাণের ক্রিয়া, এর তাপই সজীব দেহের তাপ। যখন নিশ্বাস নিই হাওয়ার সঙ্গে ভিতরে টেনে নিই অক্সিজেন; আমাদের দেহে যে প্রাণবস্তু আছে তার প্রত্যেক অণুর সঙ্গে নিরন্তর এই অক্সিজেনের অণু মিলিত হয়ে তাকে ধীরে ধীরে জ্বালাতে থাকে। এই দহনের তেজ থেকেই দেহের কোটি কোটি জীবকোষ পুষ্ট হয়। এই দহন থেকে উৎপন্ন হয় কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস যাকে নিশ্বাসের সঙ্গে বাইরে বের করে দিতে হয়, কারণ আমাদের মতো জীবের পক্ষে এই গ্যাস প্রাণঘাতক। কিন্তু এই গ্যাসের সাহায্যেই বেঁচে আছে গাছপালা। গাছের সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল (Chlorophyll) ব'লে একটা বস্তু

আছে, সূর্যের আলোতে এই ক্লোরোফিল কার্বনিক এ্যাসিড্ বাষ্পকে ভেঙে কয়লাটাকে আত্মসাৎ ক'রে নিজের পুষ্টিসাধন করে, অক্সিজেনটা তার কোনো কাজে না লাগায় দেয় ছেড়ে। আমাদের মতো নিশ্বাস-নেওয়া প্রাণী যত কার্বনিক এ্যাসিড ছেড়ে দেয় তা যদি হাওয়াতে জমা হোতে থাকত তবে বেঁচে থাকা কঠিন হোত। গাছপালার বেঁচে থাকার প্রণালী আমাদের বিপরীত ব'লেই এই বিষাক্ত গ্যাস হাওয়াতে বেশি জমা হোতে পারে না; প্রাণরক্ষার কাজে উদ্ভিদজগৎ ও জীবজগৎ অজ্ঞাতে পরস্পরকে সহায়তা করছে। হাওয়ার ভিতরে শুধু নাইট্রোজেন থাকলে আমরা দম বন্ধ হয়ে মারা যেতুম; আবার কেবলমাত্রই যদি অক্সিজেন থাকত তাহলে এই দহনের কাজ চলত এত দ্রুত যে অল্প সময়ের মধ্যেই অতিমাত্র জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যেত জীবনের ক্রিয়া। হাওয়াতে এই দুটি গ্যাস এমন ভাবে মিশে আছে যাতে দরকার মতো অক্সিজেন নিয়ে আমাদের দহনের কাজ চলছে বেশ স্বচ্ছন্দে।

হাওয়ায় যে সকল গ্যাস মিশে আছে সেগুলি সবই স্বচ্ছ, কাজেই বায়ুমণ্ডলে যে স্তরের ভাগ আছে দেখে তা বোঝা যায় না। পরীক্ষায় জানা গেছে যে এর সংঘটন বেশ জটিল; বস্তুত এ শুধু একটিমাত্র স্তর নয়, অনেক স্তর পরে পরে সাজানো। এর যে প্রথম স্তর পৃথিবীকে ঘিরে আছে য়ুরোপীয় ভাষায় তার নাম ট্রপোস্ফিয়র (Troposphere), বাংলায় বলা যেতে পারে ক্ষুব্ধস্তর। সচরাচর পাঁচ থেকে দশ মাইলের বেশি এ স্তর উঁচু হয় না, তবে স্থান ও সময়ের উপর নির্ভর করে এর উচ্চতা। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের তুলনায় ক্ষুব্ধস্তরের বিস্তৃতি যদিও খুবই কম, তবু এর মধ্যেই আছে তার সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ, কাজেই অন্যস্তরের চেয়ে এই স্তর অনেক বেশি ঘন। পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ঘিরে আছে ব'লে এই স্তর পৃথিবীর উত্তাপের পরিবর্তন সমভাবে গ্রহণ করতে

পারে। কোনো গ্যাসের ভিতর উত্তাপের বিভিন্নতা সৃষ্টি হোলে তার অণুগুলি কখনও স্থির থাকতে পারে না, কারণ উত্তাপের বৈষম্য সঙ্গে সঙ্গে এই অণু-দলের গতির বিভিন্নতা ঘটায়। ক্ষুব্ধস্তরের নিম্নতম অংশ পৃথিবীর সংস্পর্শে আছে ব'লে তার উত্তাপ অন্য অংশের চেয়ে বেশি, তাই তাপের ফলে এই স্তরের হাওয়া চঞ্চল হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করে। ঝড়, তুফান ও বৃষ্টি তাই এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষুব্ধস্তরের উপরে যে স্তর আছে সেখানে ঝড়-তুফান প্রবেশ করতে পারে না ব'লে হাওয়া সেখানে স্থির হয়ে আছে; ইংরেজিতে এ স্তরকে বলে Stratosphere, বাংলায় শান্তস্তর বলা যেতে পারে। নানা রকমের হালকা ও ভারি বায়ব জিনিস মিশে তৈরি হয়েছে বায়ুমণ্ডল; সব জায়গায় হাওয়া যদি স্থির থাকত তাহলে ভারাকর্ষণের টানে সব ভারি গ্যাস মাটির কাছে নেমে আসত, হালকা গ্যাস সব উঠে যেত অনেক উপরে। কিন্তু পৃথিবীর আবর্তনে ও স্থানীয় উত্তাপ-বিভিন্নতার জন্য ক্ষুব্ধস্তরের হাওয়ায় ক্রমাগত নাড়াচাড়া চলছে, তাই হালকা ও ভারি গ্যাস এতে এমন ভাবে মিশে আছে যে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণের বিশেষ কোনো ভেদ এখানে দেখা যায় না।

আবার এই ক্ষুব্ধস্তরেরও অনেক ভাগ আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। এর সর্বোচ্চ স্তরের উত্তাপ নিম্নতম স্তরের উত্তাপের চেয়ে ঢের কম। বেলুনে ও এরোপ্লেনে চড়ে দেখা গেছে যে পৃথিবী থেকে যতই উপরে ওঠা যায় হাওয়ার উত্তাপ ততই কমে আসে। এর কারণ জানতে হোলে বায়ব পদার্থের একটি বিশেষ গুণের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কোনো গ্যাসে চাপ দিলে সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তাপও বেড়ে যায়, আর চাপ থেকে মুক্ত হোলে প্রসারিত হয়ে তার উত্তাপ যায় অনেক ক'মে। ফুটবল ও সাইকেল 'পাম্প' করার সময় পাম্প

করার যন্ত্রের ভিতরে হাওয়া পিষ্ট হয়ে কী রকম গরম হয়ে ওঠে হয়তো অনেকের তা জানা আছে। ক্ষুব্ধস্তরের হাওয়া ক্রমাগত আলোড়িত হয়ে একবার যায় উপরে উঠে আবার নেমে আসে নিচে। উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার উপরকার চাপ যায় ক'মে, তাই প্রসারিত হয়ে এই হাওয়া ঠাণ্ডা হয়। আবার প্রবল ঝড়-তুফানে উপর থেকে হাওয়া তাড়িত হয়ে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি এলে উপরকার স্তরগুলির চাপে ঠাসা হয়ে গিয়ে তার উত্তাপ যায় বেড়ে।

শীতের সময় ভোরের বেলা ঘাসের উপর ও গাছের পাতায় শিশির জমতে দেখা যায়। এই শিশির জলের বিন্দু। হাওয়া জলীয় বাষ্পে সিক্ত হয়ে আছে; কী পরিমাণ বাষ্প এই হাওয়া ধারণ করতে পারে তা নির্ভর করে হাওয়ার উত্তাপের উপর। বাষ্পসিক্ত হাওয়াকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করলে এমন এক তাপমাত্রায় পৌঁছায় যার নিচে নামলেই এই হাওয়া থেকে কিছু বাষ্প জলকণায় পরিণত হয়। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় শীতকালে পৃথিবী আপন কক্ষে এমন আড় হয়ে থাকে যে সূর্যের আলো তার উপর তেড়চা হয়ে পড়ে, তাই আলো ও উত্তাপ পাই কম। এ সময় মাটি থাকে ঠাণ্ডা। দিনের বেলা সূর্যের তাপে মাটি গরম হয়, আবার সূর্যাস্তে পৃথিবী ধীরে ধীরে মুক্ত করে দেয় এই তাপ। তাপ ছেড়ে দিয়ে শেষরাত্রির দিকে মাটির উত্তাপ এত ক'মে আসে যে এই শীতল মাটির সংস্পর্শে এসে জলীয় বাষ্প জমে হয় জলকণা। এসব জলের বিন্দু ঘাসে ও পাতায় জমে থাকে। তাকেই বলি আমরা শিশির। এসব ক্ষুদ্র জলের কণা যখন মাটির খুব কাছে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায় তখন তাকে বলি কুয়াশা, খুব নিচু মেঘও একে বলা যেতে পারে।

সমুদ্র, নদী, পুকুর, নালা প্রভৃতি থেকে শুকনো হাওয়া আপন

উত্তাপ অর্দ্ধস্থায়ী জলের বাষ্প শুষে নেয়; হাওয়া যায় ভিজে'। এই জলসিক্ত হাওয়া মাটি থেকে কিছুদূর উপরে উঠলেই ঠাণ্ডা হয়ে মুক্ত ক'রে দেয় ছোটো ছোটো জলের বিন্দুতে তার জলীয় বাষ্প। এসব জলের কণা হাওয়ার চেয়ে হালকা ব'লে তার উপর ভেসে বেড়ায়, ভাসমান এই জলবিন্দুর সমষ্টিকেই বলি মেঘ। হঠাৎ কোনো শীতল হাওয়ার সংস্পর্শে এলে এসব ক্ষুদ্র বিন্দু একত্র হয়ে আকারে বড়ো হোতে থাকে, তখন এত ভারি হয় যে হাওয়ার উপর আর ভেসে বেড়াতে পারে না, ভারাকর্ষণের টানে নেমে আসে পৃথিবীর উপর বৃষ্টির ধারারূপে। ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে মেঘ অনেক সময় এত ঠাণ্ডা হয় যে জলের বিন্দু জমে একেবারে বরফ হয়ে যায়, তখন হয় শিলাবৃষ্টি। জলভরা মেঘ সাধারণত মাটি থেকে এক মাইলের বেশি উঁচুতে ওঠে না। এর চাইতে উপরে যেসব মেঘ থাকে তা থেকে কখনও বৃষ্টি হয় না। পেঁজা তুলোর মতো দেখতে যেসব মেঘ তাদের উচ্চতা ৫।৬ মাইল; এত উপরে মেঘে কখনো জলের বিন্দু থাকতে পারে না, অত ঠাণ্ডায় জ'মে বরফ হয়ে যায়। এসব মেঘ খুব সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের কণার সমষ্টি।

যত উপরে ওঠা যায় হাওয়ার উত্তাপ প্রতি মাইলে প্রায় ১৮° ডিগ্রি করে কমতে থাকে। পৃথিবীর উপর হাওয়ার উত্তাপ যদি ৬০।৭০ ডিগ্রি হয় তাহলে দুমাইল উপরে জলীয় বাষ্প জ'মে যাবে বরফ হয়ে। এজন্যে উঁচু পর্বতের চূড়ায় সব সময়ে বরফ জমে থাকে; সচরাচর ২½।৩ মাইল উঁচুতেই এসব বরফ দেখা যায়, অবশ্য ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এই চিরতুষার রেখারও পরিবর্তন হয়।

বেলুনে চ'ড়ে মানুষ আজ পর্যন্ত ১৩।১৪ মাইলের বেশি উঁচুতে উঠতে পারেনি। খুব উপরে ওঠার যে কী বিপদ ও অসুবিধা তার কিছুমাত্র আভাস

পেতে হোলে যাঁরা আপন প্রাণ তুচ্ছ ক'রে একাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার। তাই Glaisher ও Coxwell এবং Piccard-র বেলুনে চড়ে উপরে ওঠার কথা একটু বলব। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে Glaisher ও Coxwell সর্বপ্রথম বেলুনের সাহায্যে পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে ওঠেন। তখন একথা কারো জানা ছিল না যেখানে হাওয়ার পরিমাণ কম সেখানে শ্বাসকষ্ট নিবারণ করতে বিশেষ উপায়ে অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগ করা যায়। মাইল সাতেক উপরে উঠে তাঁরা নিচে নামতে প্রস্তুত হলেন, তখন দেখা গেল যে-সুতোর সাহায্যে ছিপি খুলে বেলুনের আবদ্ধ গ্যাস বের করে দিলে বেলুন নিচে নামবে তা বেলুনের দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সুতোর জট ছাড়াবার জন্যে Coxwell দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন, কিন্তু হাওয়ার উত্তাপ ছিল এত কম যে রক্ত জমে গিয়ে তাঁর হাত এল অবশ হয়ে। বেলুনও ক্রমাগত উপরে উঠে চলল, অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হোলো, Glaisher অবসন্ন হয়ে মূর্ছিত হলেন। দড়িবাঁধা ছিপির কাছে Coxwell যখন পৌঁছুলেন তখন তাঁর হাত দুটি সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে গেছে। মরণ নিশ্চিত জেনে তিনি তাঁর অবশিষ্ট শক্তি প্রয়োগ করে একবার শেষ চেষ্টা করলেন, দাঁত দিয়ে প্রাণপণে ছিপির দড়ি টানতেই ছিপি খুলে গেল; বেলুন ধীরে ধীরে নেমে এল মাটির উপর। রক্ষা পেলেন তাঁরা সে-যাত্রা। শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োগ যখন সহজসাধ্য হোলো, তখন বেলুনে চ'ড়ে বায়ুমণ্ডলের অভিযানের বিপদ ও অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হোলো। ১৯৩১ সালের ২৭শে মে সূর্যোদয়ের পূর্বে Piccard ও Kipfer তাঁদের বেলুন-যাত্রা আরম্ভ করেন। ২৮ মিনিটে বেলুন ৯½ মাইল উপরে উঠল। ৬½টার পরে Piccard আবিষ্কার করলেন যে আবদ্ধ গ্যাসের ছিপির দড়ি বেলুনে বাঁধা

৩২টি দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, সেই দড়ির জট না খুলতে পারলে নিচে নামার কোনো আশা নেই। সূর্যের তেজও বাড়তে লাগল, বেলুনে বাঁধা যে কুঠুরিতে তাঁরা ছিলেন সূর্যের তাপে অসম্ভব রকম তেতে উঠল তার একদিক। ৬ ঘণ্টা উপরে থাকার পরে Piccard দড়ির জট ছাড়াতে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন, পৃথিবী থেকে প্রায় দশ মাইল উপরে উঠে সূর্যের দুঃসহ ও ক্রমবর্ধমান উত্তাপে Piccard ও Kipfer বায়ুমণ্ডলে বন্দী হয়ে রইলেন। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে প্রকৃতির হাতে নিজেদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় তাঁদের ছিল না। সূর্য অস্ত গেলে বেলুনের আবদ্ধ গ্যাস ঠাণ্ডা হয়ে ঘন হোলে বেলুন আপনা থেকেই হয়তো নিচে নামতে পারে এর চেয়ে বেশি তাঁদের ভরসা করার ছিল না। সন্ধ্যার পরে উত্তাপ কমলে বেলুন আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে লাগল, ১৭ ঘণ্টা হাওয়ার উপর বন্দী থেকে তাঁরা নিরাপদে নিচে নেমে এলেন।

১৯৩৪ সালে প্রকাণ্ড এক বেলুনে ক'রে মস্কো থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী উঠেছিলেন শান্তস্তরে, কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাঁরা কেউ ফিরেননি। ১৯৩৫ সালে উত্তর আমেরিকা থেকে Anderson ও Stevenson উঠেছিলেন ৭২,০০০ ফুট উপরে; ৬০,০০০ ফুট উপরে উঠে তাঁরা বেতারে খবর দিলেন যে সেখানে হাওয়ার উত্তাপ তখন বরফের উত্তাপের চেয়ে ৬৭ ডিগ্রি কম, আকাশের নীল রং বদলে হয়েছে কালো। কুজ্ঝটিকাভেদী অদৃশ্য লালউজানী আলোর সাহায্যে তাঁরা উপর থেকে পৃথিবীর ছবি তুলেছিলেন; সেই ছবিতে পৃথিবীর দিকসীমানার রেখা দেখে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ভূপৃষ্ঠ গোলাকার, এই প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল যে পৃথিবী গোল। স্বয়ংক্রিয় অনেক যন্ত্রসহ পাডুয়া থেকে এক বেলুন আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল,

তাও ২৩ মাইলের বেশি উঁচুতে উঠতে পারেনি। এসব যন্ত্র থেকে জানা গেছে যে ৯ মাইল থেকে ২৩ মাইল পর্যন্ত শান্তস্তরে উত্তাপের কোনো ভেদ থাকে না।

ক্ষুব্ধস্তরে যেসব প্রাকৃতিক উৎপাত ও বৈচিত্র্য দেখা যায় শান্তস্তরে তার কিছুই নেই এ ধারণা আগে বিজ্ঞানীদের মনে বদ্ধমূল ছিল। তাঁরা ভাবতেন এই স্তরে যতই উপরে ওঠা যাবে হাওয়ার ঘনত্ব ও উত্তাপ ততই কমে আসবে। অল্প কিছুদিন হোলো জানা গেছে যে আপাতদৃষ্টিতে এই স্তরকে শান্ত ও বৈচিত্র্যহীন ব'লে মনে হোলেও এর ভিতর রয়েছে একটা উদ্দাম চঞ্চলতা; এর গঠনপ্রণালীও অত্যন্ত জটিল। ১৮৯৮ সালে Tessereinc de Bort বেলুন উড়িয়ে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের যে-তালিকা প্রস্তুত করেন তার পরীক্ষা থেকে জানা যায় পৃথিবীর উপরে ৭।৮ মাইল পর্যন্ত হাওয়া ঠাণ্ডা হোতে থাকে, তারপর উত্তাপ কমা হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, কিছুদূর পর্যন্ত আর কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। তার পর যতই উপরে ওঠা যায় উত্তাপ একটু একটু করে বাড়তে থাকে। প্রচলিত মতবিরোধী এই তথ্য বিজ্ঞানী মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল; de Bortর পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই আরো অনেক পরীক্ষা থেকে এর চূড়ান্ত মীমাংসা হোলো, de Bortর মতই পণ্ডিতেরা মেনে নিলেন।

শান্তস্তরে কিছুদূর পর্যন্ত কেন যে উত্তাপের কোনো পরিবর্তন হয় না সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতের পার্থক্য রয়েছে; যে-মত অনেকেই মেনে নিয়েছেন তার কথা একটু আলোচনা করব। বায়ুমণ্ডলের কোনো অংশের উত্তাপ নির্ভর করবে তার তাপ শোষণ (Absorption) ও বিকিরণ (Radiation) করার ক্ষমতার উপর, অর্থাৎ যে-তাপ তার উপর পড়বে

তা থেকে কতটা সে নিজে আত্মসাৎ করে নিতে পারবে আর কতটাই বা ফিরিয়ে দিতে পারবে তার উপর। সূর্যের রশ্মি ও পৃথিবীর এক অদৃশ্য রশ্মি থেকে বায়ুমণ্ডলে তাপ প্রবেশ করে, এই তাপ থেকে বায়ুমণ্ডলের কোন্ অংশ কী পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে সেই অংশের পদার্থের গুণ ও তাদের সংগঠনের উপর। যে পরিমাণ তাপ শোষিত হয় ঠিক সেই পরিমাণই যদি ছাড়া পায় অর্থাৎ এই নেওয়া দেওয়ার ভিতরে যদি কোনো ভেদ না থাকে তাহলে সেইস্থানে উত্তাপ-বৈষম্য হওয়া অসম্ভব। অন্যান্য আরো অনেক কারণে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ-পরিবর্তন হোতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলতে গেলে যেসব জটিল প্রশ্ন উঠবে তাদের যোগ্য আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয় ব'লেই বাদ দিতে হোলো।

কোথাও কোনো শব্দ হোলে তা আমরা শুনতে পাই ; সম্ভব হয় কী ক'রে। আন্দোলনের আঘাতে হাওয়ার ভিতর সংকোচন ও প্রসারণ হয়ে তরঙ্গাকারে ঐ আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চলার বেগে সেই তরঙ্গ আমাদের কানের পাতলা পর্দায় ঘা মেরে তাকে কাঁপাতে থাকে। এই কম্পনের অনুভূতিই শব্দ। যে-পদার্থকে আশ্রয় ক'রে এই তরঙ্গ চলাচল করে, শব্দের বেগ নির্ভর করে তার গুণ ও উত্তাপের উপর ; উত্তাপ বাড়লে ঢেউএর গতিবেগও বাড়ে। একটা তথ্য অনেকদিন থেকেই বিজ্ঞানীমহলে দুর্বোধ্য হয়েছিল—কোথাও প্রবল একটা আওয়াজ হোলে তার শব্দ সাধারণত ৬০।৬৫ মাইল দূরে গিয়েই মিলিয়ে যায়, তারপরে প্রায় ১২৫ মাইল ব্যাপী এক সুদীর্ঘ মণ্ডলে এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, তারপরে আবার সেই শব্দই বেশ পরিষ্কার শোনা যায়। নিকটবর্তী স্থান নিঃশব্দে পার হয়ে কী ক'রে যে দূরবর্তী স্থানে শব্দতরঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে তার সন্তোষজনক কোনো

জবাব অনেকদিন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জার্মান পণ্ডিত Von dem Borne সর্বপ্রথমে এর একটা মীমাংসা করেন। একথা বলা হয়েছে যে আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে ঢেউ উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; যে-ঢেউ সোজা মাটির উপর দিয়ে চলাচল করে, হাওয়ার অণু তাদের আস্তে আস্তে শুষে নেয়। ৬০।৬৫ মাইলের মধ্যেই এই ঢেউএর গতি এতটা প্রতিহত হয় যে কানের পর্দায় অতি মৃদু কম্পনের সৃষ্টি করে, তা আর অনুভূতিতে পৌঁছয় না। আবার যেসব ঢেউ উপর দিকে উঠে যায় তারা ক্ষুব্ধস্তর পার হয়ে শান্তস্তরে প্রবেশ করে, সেখান থেকে কোনো উপায়ে প্রতিফলিত হয়ে নিচে ফিরে আসে। এভাবে প্রতিফলিত হোলে আন্দোলনের মূল কেন্দ্র থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরেও শব্দ শোনা আশ্চর্য নয়। সাধারণত শব্দতরঙ্গ এক সরল রেখা ধরে চলে, কিন্তু ক্ষুব্ধস্তরের ভিতর দিয়ে উপরে ওঠার সময় উত্তাপের হ্রাসবশত ক্রমাগত তার গতি পরিবর্তন হয়ে আরো উপরে উঠে যায়, তারপর যখন শান্তস্তরে প্রবেশ করে, সেখানে কিছুদূর পর্যন্ত উত্তাপ সমান থাকায়, এই ঢেউ আবার সোজা লাইন ধরে চলতে থাকে। শান্তস্তরের এই অংশে হাওয়ার পরিমাণ এত কম যে শব্দতরঙ্গ বিনা ক্ষতিতে অনেক দূর যেতে পারে। কিছুদূর উপরে উঠলেই শান্তস্তরের উত্তাপ একটু একটু ক'রে বেড়ে চলে; তখন গরম হাওয়া এই স্তরে শব্দতরঙ্গের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেয় নিচের দিকে। এইভাবে প্রতিসৃত ও প্রতিফলিত হোলে শব্দের ঢেউ আন্দোলনের মূল কেন্দ্র থেকে বহু দূরে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসতে পারে। বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে শব্দতরঙ্গের গতিবেগ ও গতিরেখার পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে এক আশ্চর্য খবর পাওয়া গেল—শান্তস্তরে উত্তাপবৈষম্য থাকতে পারে না ব'লে বিজ্ঞানীমহলে যে-ধারণা এতদিন প্রাধান্য পেয়ে এসেছিল সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর ক'রে শব্দের

ভৈশ্যরবু সাহায্যে এই প্রথম প্রমাণ হোলো যে শান্তস্তরে যতই উপরে ওঠা যাবে উত্তাপ আস্তে আস্তে বেড়েই চলবে।

আরো উঁচু স্তরের কোনো খবর জানতে হোলে আলো ও বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের সাহায্য নিতে হবে। বৈদ্যুতিক ঢেউ সম্বন্ধে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার, কোথাও যদি বিদ্যুতের কম্পন চলতে থাকে তাহলে সেস্থানকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্যুতের ঢেউ সৃষ্টি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; এই ঢেউয়ের গতিবেগ আলোর গতিবেগের একেবারে সমান, সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। আলো ও বৈদ্যুতিক ঢেউ শান্তস্তরের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাচল করে ব'লে পৃথিবীতে আসার সময় সেখানকার অনেক আশ্চর্য খবর সঙ্গে ক'রে আনে। সূর্যের সাদা আলোর ভিতর জড়িয়ে আছে সাতটি বিভিন্ন রঙের আলো। বেগুনি, অতিনীল, নীল, সবুজ, হলদে, নারাঙি ও লাল এই সাতটা রঙ চোখে দেখতে পাই, কিন্তু এদের দুই প্রান্ত পেরিয়ে এমন অনেক আলোর ঢেউ আছে যারা আমাদের চোখে ধরা দেয় না, কিন্তু স্বাক্ষর রেখে যায় ক্যামেরার প্লেটে। বেগুনি আলোর সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে অদৃশ্য আলো তাকে বলা হয় বেগনিপারের আলো, আর লাল পেরিয়েছে যে আলো তার নাম লালউজানি আলো।

নকল সূর্যালোক সৃষ্টি ক'রে তার আলো বিশ্লেষণ করলে যে-পরিমাণ বেগনিপারের আলোর সন্ধান পাওয়া যায়, সৌরবর্ণালীতে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে আসার পর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কিছু আলো শোষিত হয়েছে তার ভিতর থেকে, এই আলোর বেশির ভাগই বেগনিপারের আলো। এই পরীক্ষার ফলে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে Hartley প্রথম অনুমান করেন যে সূর্যের আলো থেকে এই বেগনিপারের আলো অপহৃত হওয়ার

মূলে রয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ওজোন (Ozone) গ্যাসের একটি স্তর।

এখন প্রশ্ন হোলো এই ওজোন স্তর কোথায় আছে, সৌরমণ্ডলে না পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। সৌরমণ্ডলে এর স্থিতি হোলে যে-বেগনিপারের আলো পৃথিবীতে আসে তার পরিমাণে কখনো ভেদ দেখা যেত না, কিন্তু পরীক্ষায় জানা গেছে যে আকাশে সূর্যের স্থানপরিবর্তনের সঙ্গে এরও পরিমাণের কমিবেশি হয়। আকাশে সূর্যের স্থান ও বেগনিপারের আলোর প্রাখর্য এক অচ্ছেদ্য নিয়মে বাঁধা আছে; এই নিয়ম থেকে ওজোন স্তরের উচ্চতা স্থির করা হয়েছে। সাধারণত পৃথিবী থেকে ১৫ মাইলের ভিতর এই স্তর থাকে; এর গভীরতা খুবই কম, কিন্তু বেগনিপারের আলো শুষে নেওয়ার ক্ষমতা আশ্চর্য রকম বেশি। সব শুষে নিতে পারে না, আমাদের দেহপুষ্টির জন্যে যতটুকু দরকার তাই আসতে দেয় পৃথিবীতে। ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে যে জটিল ও উন্নত দেহ মানুষ আজ পেয়েছে তা এর চেয়ে প্রখর বেগনিপারের আলোর তেজ সইতে পারে না। কোনো কারণে বায়ুমণ্ডল থেকে আজ যদি ওজোন স্তর সরে যায় তাহলে যে তীব্র বেগনিপারের আলো পৃথিবীতে পৌঁছবে তার তেজ কোনো প্রাণীই সইতে পারবে না।

বেগনিপারের আলো তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগ ঘটিয়ে ওজোনের একটি অণু সৃষ্টি করে, কিন্তু এই ওজোনের অণু আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে এমন স্থানে যেখানকার তাপমাত্রা খুবই কম। বায়ুমণ্ডলের ক্ষুব্ধস্তরে উত্তাপ বেশি ব'লে সেখানে ওজোন তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার পরিণতি ঘটে অক্সিজেন গ্যাসে। খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়ে থাকা যেন ওজোনের স্বভাববিরুদ্ধ, কারণ সূর্যালোক থেকে ওজোন যতটা তেজ আত্মসাৎ করে, তার চেয়ে অনেক কম ফিরিয়ে দেয়,

ওজোন নেওয়া দেওয়ার ব্যাপারে এতখানি অসামঞ্জস্য থাকায় অল্পসময়ের ভিতরেই এর উত্তাপ বেড়ে উঠে' এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন ওজোন আর আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না, ভেঙে পড়ে তিনটি অক্সিজেন পরমাণুতে। শান্তস্তরের খুব নিম্ন উত্তাপে ওজোন কিছুকাল স্থায়ী হোতে পারে তাই এই স্তরেই ওজোন থাকা সম্ভব। ওজোন সূর্যের আলো শুষে নেয় ব'লে ওজোনমণ্ডলের উপরিভাগ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে; পরীক্ষায় জানা গেছে যে ২৫ মাইল উর্ধ্বে বায়ুরাশি প্রায় ফুটন্ত জলের মতো তপ্ত। সমতাপমণ্ডলের উর্ধ্বে এই উত্তপ্ত বায়ুস্তর উর্ধ্বগামী শব্দ-তরঙ্গের গতিরেখা পরিবর্তিত ক'রে ফিরিয়ে দেয় নিচের দিকে।

বেগনিপারের আলোর সাহায্যে অক্সিজেন থেকে ওজোন সৃষ্টি হয় ব'লে অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় জানা গেছে যে মেরুপ্রদেশে ওজোন আছে খুব বেশি, আর ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণের কমিবেশি দেখা যায় এই প্রদেশেই সবচেয়ে বেশি। বসন্তকালে দীর্ঘ মেরুরাত্রির অবসানে বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে ওজোনের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। এই পরীক্ষা থেকে বলতে হবে শুধু বেগনি-পারের আলোই যে ওজোন সৃষ্টির একমাত্র কারণ তা নয়, মেরুপ্রদেশে বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে বিদ্যুৎস্ফুরণের ফলেও ওজোন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ওজোনমণ্ডলের উপরে ৪০।৫০ মাইল উর্ধ্বে বায়ুরাশি সম্বন্ধে খবর পাওয়ার একটি অতি আশ্চর্য উপায় জানা গেছে। মেরুপ্রদেশে বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে কখনো কখনো মেঘের আবির্ভাব দেখা যায়। সাধারণত জলীয় বাষ্প থেকেই মেঘের সৃষ্টি হয়, কিন্তু এত উঁচুতে জলীয় বাষ্প থাকা অসম্ভব। এসব মেঘের উপাদান কী তা এখনো ঠিক জানা যায়নি। মেরুপ্রদেশে যখন রাত্রি, আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন সূর্যের কিরণ এই মেঘের উপর প'ড়ে এক অপরূপ আলোকের সৃষ্টি করে।

সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত এই মেঘমালার গতি পর্যবেক্ষণ ক'রে উচ্চাকাশের এই অংশে বায়ুর গতিবেগ স্থির করা হয়েছে ; জানা গেছে ৪০।৫০ মাইল ঊর্ধ্বেও বায়ু সবসময় স্থির হয়ে নেই, এখানেও একটা প্রবল বায়ুস্রোত আছে এবং তার বেগ কখনো কখনো ঘণ্টায় ৪০০ মাইল পর্যন্ত হয়।

৫০।৫৫ মাইল থেকে ২০০।২৫০ মাইল পর্যন্ত উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা জানবার জন্যে কয়েকটি উপায় আছে। মেরুপ্রদেশের উচ্চাকাশে সময় সময় এক অভিনব আলোকমালা দেখা যায়, এর ইংরেজি নাম Polar Lights, বাংলায় বলা যেতে পারে মেরুজ্যোতি। বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ হয়, এর কারণ এখনো নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। সূর্যের অভ্যন্তরে প্রচণ্ডতাপে পরমাণুর দল ভেঙে বৈদ্যুতকণায় পরিণত হয় ; ভিতরের অসহ্য চাপের ঠেলায় মাঝে মাঝে এসব ভাঙা পরমাণুর দল সূর্যপৃষ্ঠ ভেদ করে উৎক্ষিপ্ত হয় প্রচণ্ড বেগে বহু ঊর্ধ্বে। সূর্য থেকে প্রক্ষিপ্ত এই বৈদ্যুতের দল পৃথিবীর নিকটে এসে তার চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে মেরুপ্রদেশের দিকে ধাবিত হয়, তারপর উচ্চাকাশের বায়ুরাশিতে প্রবেশ ক'রে এক বিদ্যুৎস্ফুরণের সৃষ্টি করে। একটা কথা এখানে ব'লে রাখা দরকার, ধাবমান বৈদ্যুৎকণা কোনো চুম্বকের শক্তিক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তার চলার পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়, পজিটিভ ও নিগেটিভ বৈদ্যুতের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক, তার প্রমাণ পাই একটি কম্পাসের কাঁটার আচরণ দেখে ; কম্পাসের ক্ষুদ্র চুম্বক যেদিকেই রাখা হোক না ঘুরে ফিরে উত্তর দক্ষিণ দিকেই স্থির হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারি একটা অদৃশ্য আকর্ষণ এর স্থিতি নিয়ন্ত্রিত করছে। মেরুপ্রদেশের দীর্ঘ ছয় মাস-ব্যাপী রাত্রির অন্ধকার এই মেরুজ্যোতির আলোকে কিছু পরিমাণ দূর হয়।

মেরুজ্যোতি [পৃ. ৪৮
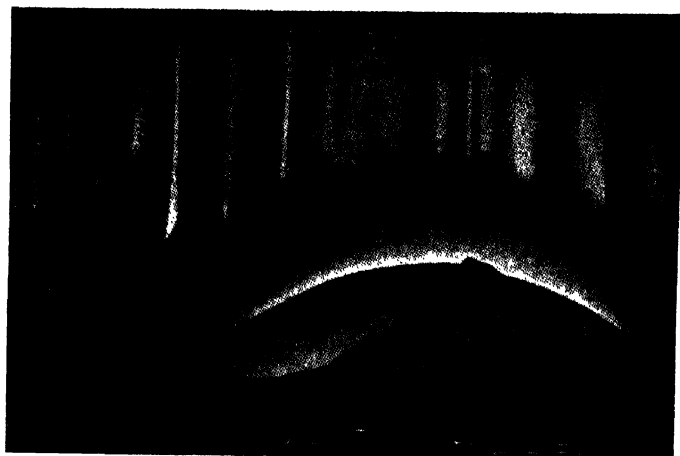
মেরুজ্যোতি [পৃ. ৪৮
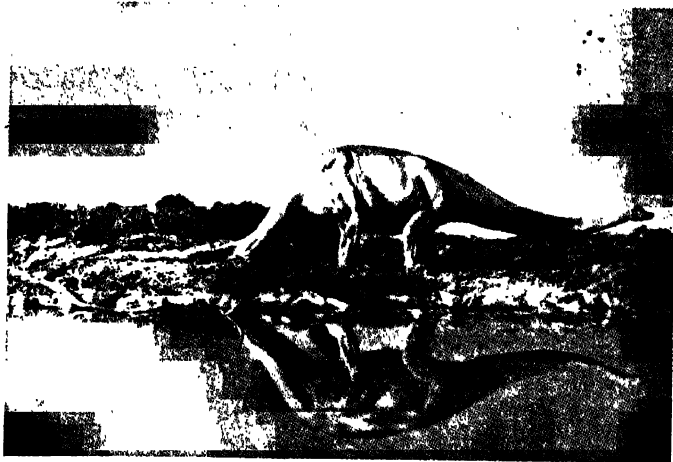
প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃহত্তম জন্তু 'ডিপ্লোডোকস' [পৃ. ৬৬
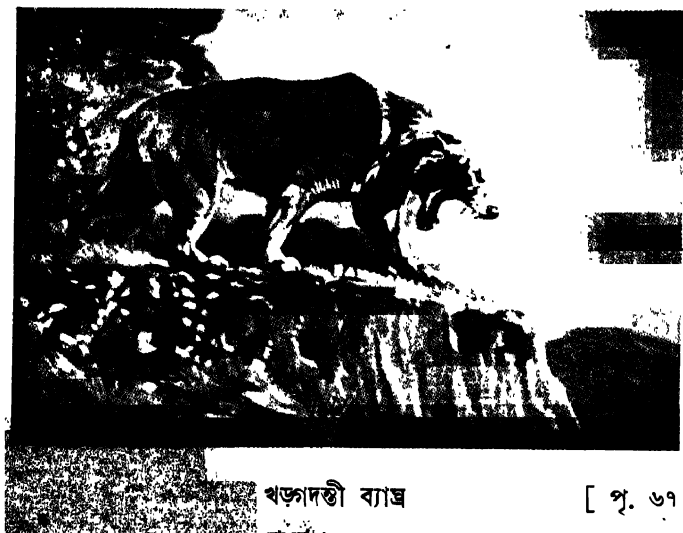
খড়্গদন্তী ব্যাঘ্র [পৃ. ৬৭

চোখে না দেখলে শুধু বিবরণ প'ড়ে এই জ্যোতির অপরূপত্ব ধারণা করাই যায় না। এর আবির্ভাব, তারপর সমস্ত আকাশময় বিচিত্র রঙের আলোর খেলা, প্রত্যেকটি দৃশ্যই দর্শকের মনে গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার করে। প্রথমে হরিতাভ পীত রঙের (greenish yellow) একটি বৃত্তাকার স্নিগ্ধ জ্যোতির আবির্ভাব হয়, প্রায় ঘণ্টাখানেক এই আলো সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে এর নিম্নদেশ উজ্জ্বলতর হয়ে লাল, নীল, সবুজ ও বেগনি আলোর বিচিত্র ছটা উর্ধ্বাকাশে পরিব্যাপ্ত হয়। কখনো বা এই উজ্জ্বল আলোর প্রবাহ কুণ্ডলীকৃত হয়ে একটা বিরাট সার্চলাইটের মতো সমস্ত আকাশ আলোর প্লাবনে উদ্ভাসিত করে তোলে, আবার কখনো বা অতি সূক্ষ্ম এক অপরূপ আলোর পর্দার রূপ ধ'রে দুলতে থাকে, আর তা না হোলে একটা অদ্ভুত নৃত্যের ছন্দে সমস্ত আকাশপথ মথিত ক'রে আবর্তিত হোতে থাকে। মনে হয় যেন এই প্রলয় নৃত্যে আকাশ ভেঙে নিচে নেমে আসবে। এই বিচিত্র রঙের আলোর খেলা যখন চরমসীমায় পৌঁছে তখন হঠাৎ এর পরিসমাপ্তি হয় ; এক বিচ্ছুরিত মৃদু আলোক ছাড়া আর কিছুই তখন দেখা যায় না। এই আলো দেখলেই মনে হয় যেন আকাশের বায়ুরাশি এক প্রচণ্ড বৈদ্যুতশক্তির তাড়নে বিপর্যস্ত। ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই এই স্তরে আবার একটা দীপ্তিশিখা উচ্চাকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে দুলতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে এই দীপ্তি নিভে গিয়ে মুহূর্তপূর্বের আলোকিত আকাশে অন্ধকারের একটা গাঢ় পর্দা ফেলে দেয়। ১১ বছর পর পর যখন সূর্যের গায়ে কালো দাগ বেড়ে ওঠে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘন ঘন চৌম্বক ঝড় বয়ে যায়, এই মেরুজ্যোতি তখন পরিপূর্ণ সমারোহে মেরুপ্রদেশের উচ্চাকাশে আবির্ভূত হয়।

এই জ্যোতি ছাড়া বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে আরো এক প্রকার

আলোকের সন্ধান পাওয়া গেছে; এই আলো শুধু মেরুপ্রদেশে নয় পৃথিবীর সর্বত্রই আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অমাবস্যার গভীর অন্ধকারেও দূরে গাছপালা বাড়িঘর অস্পষ্টভাবে দেখা যায়; আপাতদৃষ্টিতে মনে হোতে পারে যে নক্ষত্রের আলোর সাহায্যে হয়তো আমরা দেখতে পাই, কিন্তু সূক্ষ্ম হিসেব কষলে দেখা যায় যে প্রায় অর্ধেক আলো দেয় নক্ষত্রগুলি আর বাকি অর্ধেক আসে আকাশ থেকে। হরিতাভ এক মৃদু আলোকে রাত্রির আকাশ উদ্ভাসিত। নৈশাকাশের এই আলোকের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে গত ১০।১৫ বছর ধ'রে অনেক পরীক্ষা চলছে। ৬০ মাইল উর্ধ্বে হাওয়ার অণুপরমাণু দিনের বেলায় সূর্যের আলো শুষে নিয়ে তেজ সঞ্চিত করে রাখে, রাত্রিতে ঐ তেজপূর্ণ অণু পরমাণু থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। মেরুজ্যোতি ও নৈশাকাশের আলোকের বর্ণালী পরীক্ষা ক'রে বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে হাওয়ার অবস্থা ও উপাদান সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানেও অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস আছে, কিন্তু ক্ষুব্ধস্তরের মতো অক্সিজেন এখানে আণবিক অবস্থায় না থেকে পরমাণবিক অবস্থায় আছে।

পৃথিবী থেকে যতই উঁচুতে ওঠা যায় হাওয়ার পরিমাণ ততই কমতে থাকে। ছয় মাইল উঁচুতে বায়ুর ঘনত্ব ভূতলের বায়ুর প্রায় একতৃতীয়াংশ, ৩০ মাইল উঁচুতে দুই সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। এখন প্রশ্ন ওঠে বায়ুমণ্ডলের শেষ কোথায়। উত্তরে বলা যেতে পারে যে উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব এত কমে আসে যখন তার অণুপরমাণুর পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ঘটা খুবই বিরল হয়ে ওঠে। এই বায়ুরাশি থেকে অণুপরমাণুর দল আপন গতিবেগে, পরস্পরের সংঘাত এড়িয়ে, শূন্যে চলে যেতে পারে, কিন্তু বহুউর্ধ্বে উঠেও পৃথিবীর

আকর্ষণে আবার নিচে ফিরে আসে। বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত হাওয়ার এই অণুপরমাণুর দল ৫।১০ হাজার মাইল পর্যন্ত উপরে ওঠে। এই ধাবমান অণুপরমাণুর সমষ্টিকে বায়ুমণ্ডলের 'ছটা' বা Spray বলা যেতে পারে। এদের সংখ্যাও ক্রমশ বিরল হয়ে আসে, অবশেষে এই ছটা মহাশূন্যের সঙ্গে মিশে যায়।

প্রাণের প্রকাশ, ভূতত্ত্ব ও প্রাক্কালীন প্রাণীবৃত্তান্ত

বাষ্পদেহ নিয়ে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সূর্য থেকে। একটা কঠিন স্থায়ীরূপ নিতে এর কেটেছে বহুযুগ। কখনো জমাট বাঁধলে এর ভিতরকার অবরুদ্ধ বিপুল তেজ তখনই সেই কঠিন আবরণ ভেঙে মুক্তি লাভ করেছে। এই ভাঙা ও গড়ার দ্বন্দ্বে বহুকাল চলেছে পৃথিবীর উপর ভয়ানক একটা অস্থিরতা। তারপর ক্রমাগত তেজ ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সেই প্রচণ্ড ভাঙনশক্তির বেগ যখন কমে এল তখনই কঠিন আবরণ একটু স্থিতির অবকাশ পেল। মাত্রা অনেকটা কমলেও তেজের উৎপাত তখনো একেবারে শেষ হয়নি। প্রায় দেড়শো কোটি বছর চলেছে পৃথিবীর উপর এই অশান্তি যার আঘাতে বিভিন্ন অজৈব পদার্থের উলটপালট ভাঙাগড়ায় বিচিত্র সৃষ্টি ও পরিবর্তন চলছিল। তারপর তেজের উদ্দামতা যখন অনেকটা শান্ত হয়ে এল তখন সেই বিরাট প্রাণহীনতার মধ্যে কোথা থেকে, কেমন করে জানি না, জেগে উঠল এক অস্ফুট প্রাণের সাড়া। সৃষ্টির কারখানা ঘরে যেসব অজৈব পদার্থ নিয়ে তখন কারবার চলছিল তাদের সঙ্গে এই প্রাণের কোনো মিল নেই, এর ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম থেকেই জীবের মধ্যে রয়েছে দেহের পুষ্টিসাধন; আত্মরক্ষা ও নিজের অনুরূপ জীব সৃষ্টি করার অদম্য প্রয়াস; জড়ের মধ্যে তো বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধি করার কোনো উদ্যম নেই। প্রাণের প্রথম প্রকাশ হোলো একটি অদৃশ্য জীবকোষকে বাহন ক'রে; তারপর এরা সংঘবদ্ধ হয়ে উৎকর্ষ, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের

ভিতর দিয়ে এই প্রাণলোককে এক অভিনব সৃষ্টির পথে নিয়ে চলল। নিজেকে বহুগুণিত করার একটা আশ্চর্য শক্তি দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে তারা মৃত্যুকে জয় করল।

প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল যে বিপুল তেজ তারই আঘাতে ইলেক্‌ট্রন-প্রোটোন জাতীয় বৈদ্যুতকণার মিলনে যেদিন কয়লার পরমাণু প্রথম আত্মপ্রকাশ করল সেদিন থেকেই সূচনা হোলো জৈবজগৎ সৃষ্টির। খুব সাধারণ জিনিস এই কয়লা কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য তার ব্যবহার; এর একটা বিশেষ গুণ এই যে হাজার হাজার পরমাণুর সংযোগ ঘটিয়ে প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো অণু সৃষ্টি করতে পারে। অজৈব পদার্থের অণুর মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা খুব বেশি থাকে না কিন্তু জৈব জিনিসের ভিতর সব সময় থাকে অঙ্গারপদার্থ তাই বহুসংখ্যক পরমাণুর মিল ঘটিয়ে জৈব অণুর তহবিল ভারি ক'রে তোলে; সৃষ্টি হয় প্রাণের একটা ভূমিকা। আবার কেউ কেউ বলেন পৃথিবীতে প্রাণশক্তি এসেছে বাইরে থেকে। সৃষ্টির পরে পৃথিবীতে যখন জলীয় বাষ্প জ'মে জলে পরিণত হোলো, তখনই দেখা গেল প্রাণের প্রকাশ। যে-সব উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে আসে তাদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে কতকগুলি যৌগিক ও খনিজ পদার্থ থাকে এদের ভিতর। এসব পদার্থের সন্ধান আজও পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি, এদের মধ্যেই রয়েছে প্রাণপদার্থের মূল জিনিস। পৃথিবীর হাওয়া ও জলের সংস্পর্শে এলে এসব জিনিস ভেঙে নূতন জিনিসের সৃষ্টি হয়, এই ভাঙাগড়ার কাজে যে-তেজ ছাড়া পায় তাই দিয়েছে প্রাণের শক্তি। নিয়ত এই ভাঙাগড়ার কাজ চলতে থাকে, তার থেকেই ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে প্রাণীজগৎ।

অতিক্ষুদ্র জীবকোষকে বাহন ক'রে জড়ের বিপরীতধর্মী জিনিস আপনার প্রাণ, মন ও সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ একটা যুগে এল

পৃথিবীতে। পরমবিস্ময়কর এই প্রাণের সর্বপ্রথম যে-চিহ্ন দেখা গেছে সে হচ্ছে এক জাতের শ্যাওলা, য়ুরোপীয় ভাষায় একে বলে অ্যাল্‌গে (Algae)। পাথরের ভিতরে পাওয়া গেছে এর ছাপ। বহুযুগ ধরে দুই টুকরো পাথরের চাপে বন্দী থাকায় এই শ্যাওলা পরিণত হয়েছে পাথরে; সর্বপ্রথম প্রাণের স্বাক্ষর রয়ে গেছে পাথরের চাপে। এইখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার অন্য জন্তুদের মতো গাছপালা, ঘাস, শ্যাওলাও প্রাণী। তারপর যেসব জীবের চিহ্ন পাওয়া যায় তা পোকা ও মাছের, তাদের কঙ্কাল রক্ষিত আছে পাথরের মধ্যে। তারপর আস্তে আস্তে জন্মেছে গাছপালা, অবশেষে দেখা দিয়েছে অদ্ভুত আকারের সব অতিকায় জন্তু।

নিজের অনুরূপ জীবকে পৃথিবীতে জন্ম দিয়ে সৃষ্টি রক্ষা করা জীবের একটা বিশেষ ধর্ম। কিন্তু কোনো জীবই একেবারে নিজের মতো জীব সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের বংশধরদের ভিতর কিছু না কিছু পার্থক্য থেকে যায়। তাই আজ পৃথিবীর এত কোটি জীব একে অন্যের চেয়ে আচার ব্যবহারে এত স্বতন্ত্র; কেউ সুস্থ সবল আবার কেউ বা দুর্বল। জীবনযাত্রায় শত্রুর সঙ্গে লড়াই ক'রে বেঁচে থাকতে দুর্বল জীব পড়ছে ক্রমাগত পিছিয়ে, আর সবল তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলছে এগিয়ে। জীবের আকার, কার্যকলাপ, রীতি নীতি এ সবই নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে জীবজন্তুর শরীর সংগঠন থেকে আরম্ভ ক'রে তাদের জীবনধারার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে দক্ষিণভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বেঙজাতীয় উভচর জন্তু যে ভাবে গ'ড়ে ওঠে তাতে তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। পারি-

পার্শ্বিক-অবস্থার মধ্যে কোথাও মিল বা সামঞ্জস্য থাকলে এই উভচর জন্তুদের সমষ্টিগত জীবনেও সেরূপ মিল বা সামঞ্জস্য দেখা যায়। যেসব বনভূমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেসব স্থানে বেঙের চালচলনেরও একটা অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। বায়ুর চাপ, উষ্ণতা, খাদ্য-সংস্থান, ভূমির আর্দ্রতা, উদ্ভিদাদির অবস্থান বেঙের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং এদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বহু ব্যাপারের পরিবর্তন সাধন করে। বিভিন্নবর্গের বেঙ একই আবহাওয়ায় বেড়ে উঠলে তাদের মধ্যে যেরূপ মিল দেখা যায় তাতে ব্যবচ্ছেদমূলক পরীক্ষা ব্যতীত তাদের শ্রেণি-বিভাগ কঠিন হয়ে ওঠে। একই মূলবংশ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে বিভিন্নবর্গের বেঙের উৎপত্তি ও তাদের শ্রেণিবিভাগে এত জটিলতার উদ্ভব ঘটেছে। পুরোনো দিনে সৃষ্টির আরম্ভে তখনকার অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে যেসব প্রাণী বেঁচেছিল, আজ এতদিন পরে এত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তাদেরও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটেছে। এখন যেমন গাছের মধ্যে ডাল পাতা ফুল ফলের সৌষ্ঠব দেখা যায় তখনকার গাছে তার কিছুই ছিল না। যেসব অতিকায় অসমর্থ জীব তখন বেঁচেছিল আজ তারা লোপ পেয়েছে। একই জীব বিভিন্ন অবস্থায় থাকলে ধীরে ধীরে তার আচার ব্যবহার এমন কি আকারেরও পরিবর্তন হয়। বেশি দিন এই অবস্থায় থাকলে এদের সৃষ্ট জীবদের দেহেরও আমূল পরিবর্তন ঘটে, তখন একই জীবের বংশধর ব'লে এদের চেনার আর কোনো উপায় থাকে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সৃষ্টির গোড়া থেকে পৃথিবীর ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে ব'লে প্রাণিজগতের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তাই সৃষ্টির কারখানা ঘরে এত বিচিত্র প্রাণীর সমাবেশ।

পুরোনো দিনে পৃথিবী কী অবস্থায় ছিল, কত যুগ ধরে এর বিকাশ

চলছে, আর কখনই বা এতে প্রাণের প্রথম প্রকাশ হোলো সেসব কথাই এখন কিছু বলা যাক। অতীত দিনে যা ঘটেছিল তার অনেক প্রমাণ আজও ছড়িয়ে আছে নানা স্থানে; এসব যোগাড় ক'রে তার থেকে খুব সাবধানে পৃথিবীর তখনকার অবস্থার কথা আমাদের বলতে হবে। ভূতত্ত্বের প্রশ্ন খুবই জটিল, আমরা এমন একটা সময়ের খবর জানতে চাই যখন কোনো জীবই পৃথিবীতে আসেনি, আর এলেও এমন কোনো ভাষা তাদের ছিল না যা তারা লিখে রেখে গেছে। সেই অজ্ঞাত ইতিহাসের শূন্য পৃষ্ঠায় মানুষের না-জানা ভাষায় পর পর যেসব রহস্য সাজানো আছে তা খুঁজে বের করা যে কী কঠিন কাজ তা এ পথের পথিক ছাড়া আর কেউ সহজে বুঝতে পারে না। পৃথিবী ঘুরতে বের হোলে দেখতে পাওয়া যায় কোথাও সমুদ্রের তীরে রয়েছে প্রকাণ্ড পাহাড় যার গায়ে ক্রমাগত ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে আবার কোথাও হয়তো পাহাড় পর্বতের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু আছে বহুদূরবিস্তৃত বালুকারাশি। কোথাও পাহাড়ের উপর দেখা যায় পাথরে নিহিত সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল বা বা কঙ্কালের দাগ; এসব জীবের বাস ছিল জলের নিচে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে এত উঁচুতে পাওয়া গেছে এসব চিহ্ন যেখানে প্রবল ঝড়েও সমুদ্রের ঢেউ পৌঁছবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ থেকে প্রমাণ হয় যে এই পাহাড়ই একদিন ছিল সমুদ্রের নিচে, কোনো প্রাকৃতিক শক্তি এ'কে ঠেলে তুলে দিয়েছে জলের উপর। এসব চিহ্নের সন্ধান থেকে পৃথিবীর পুরোনো দিনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার ইতিহাসের হাজার হাজার বৃত্তান্ত এখনো দুর্বোধ্য হয়ে আছে আমাদের কাছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌতাত্ত্বিকের কাজের ধারা অনেকটা এক রকম। কোনো লুপ্ত জাতির অজ্ঞাত ইতিহাসের খোঁজ করাই প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ; মাটি খুঁড়ে তাঁকে বের করতে হয় কোনো পুরোনো নগরের

চিহ্ন, স্থির করতে হয় ভগ্নাবশেষের ক্রমপর্যায়, তাম্রলিপি ও শিলালিপি তিনি সংগ্রহ করেন সযত্নে, তারপর এসব থেকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন এমন একটা জাতির জীবনের ছবি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে শিল্পে যাদের বিশিষ্টতা পাওয়া যায়। পরিবর্তনই জগতের নিয়ম, তাই কালকের জিনিসের কোনো চিহ্নই আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বহুকাল ধ'রে কত জীব, জন্তু তাদের কঙ্কাল রেখে গেছে পাথরের মধ্যে, পুরোনো দিনের আরো কত বিচিত্র জিনিস ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর উপর—এরাই ভৌতাত্ত্বিকের শিলালিপি। যে কথা এরা লিখে রেখে গেছে পাষাণের গায়ে মানুষের না-জানা ভাষায় তারই বর্ণমালা স্থির ক'রে বের করতে হবে পৃথিবীর অতীত ইতিহাস। কাজ খুবই জটিল, কারণ পুরোনো দিনের যেসব চিহ্ন পাওয়া যায় তা বইয়ের পাতার মতো পর পর সাজানো নেই, উলট পালট হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাদের পারম্পর্য স্থির করতে মানুষের অনেক যুগ কেটেছে।

কত কাল ধ'রে পৃথিবীর বিকাশ চলছে তার হিসাবের একটা পথ পাওয়া গেছে, সেটা জেনে রাখা ভালো। মাদাম কুরি নামে ফরাসী দেশীয় এক মহিলা বিজ্ঞানী রেডিয়ম নামে একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক জিনিসের আবিষ্কার করেন; এই পদার্থটি অতি দুর্লভ। এই রেডিয়মের ভিতর থেকে সব সময়ই বৈদ্যুতকণিকা ও আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। রেডিয়মের পরমাণুর মধ্যে বিপুল তেজ সঞ্চিত আছে ব'লে সব সময় এর ভিতর চলছে একটা ভাঙার কাজ। এর পরমাণু ভেঙে সৃষ্টি হচ্ছে সীসের পরমাণু, ভাঙার সময় মহাবেগে বেরিয়ে আসছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুত-কণিকা, এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'আল্‌ফা' ও 'বিটা' কণিকা (α & β particles)। এই বৈদ্যুতের দল হাওয়ার পরমাণুর প্রলয় ঘটিয়ে আলো ছড়াতে থাকে, তাই এ'কে অন্ধকারেও দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের

পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে রেডিয়মের এই ভাঙার কাজ চলে একেবারে সমান একটানা গতিতে, কোনো অবস্থাতেই এর এতটুকু এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই। কী নিয়মে এই ভাঙন চলছে, কতটা রেডিয়ম ভাঙতে কী সময় লাগে, তাতে সীসের সৃষ্টি হয় কী পরিমাণ, এসব তথ্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় স্থির হয়ে গেছে। একটা পাত্রে কিছু রেডিয়ম যদি আমরা ওজন করে রেখে দিই এবং কয়েক বছর পরে আবার ওজন করে দেখি তাতে কতটা রেডিয়ম বাকি আছে ও কতটা সীসের সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে ব'লে দিতে পারব এই ভাঙার কাজ কত বছর ধরে চলে আসছে। ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম নামে আরো দুটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক জিনিসের খোঁজ পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যেও সব সময়েই ভাঙাগড়ার কাজ চলছে, ভাঙার সময় এদের পরমাণু থেকেও প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসে 'আল্‌ফা' ও 'বিটা' কণিকা। বাধা না পেলে এদের গতির পরিমাণ দাঁড়ায় সেকেণ্ডে প্রায় ৫৬ হাজার মাইল, প্রায় ৪ সেকেণ্ডে সমস্ত পৃথিবীটাকে একবার ঘুরে আসতে পারে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে একটুকরো ইউরেনিয়মের অর্ধেক পরিমাণ ভাঙতে লাগে প্রায় ৬০০ কোটি বছর।

এখন মনে করা যাক একটা পাহাড় কত বছরের পুরোনো তা বের করতে হবে। ঐ পাহাড়ের কোনো পাথরের মধ্যে এক টুকরো রেডিয়ম যদি আমরা পাই তাহলে সেই পাথরের বয়স স্থির করা খুবই সহজ হবে। পাথরের মধ্যে কতটা রেডিয়ম ক্ষয় হয়েছে তা পরীক্ষা ক'রে স্থির করা কঠিন নয়; ঠিক ঐ পরিমাণ রেডিয়ম ক্ষয় হোতে কত বছর লেগেছে রেডিয়ম-বিশ্লিষ্টতার নিয়ম থেকে অতি সহজে তা জানা যায়। আমেরিকার পূর্ব ক্যানাডার কোনো পাহাড়ের পাথরে রেডিয়ম পাওয়া

গেছে। পরীক্ষা করে যে-হিসেব বেরিয়েছে তার থেকে জানা যায় যে প্রায় ১২৩ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে এই পাহাড়ের।

খুব পাতলা কতকগুলি অভ্রের টুকরো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে পর পর দেখলে অনেক সময় এদের মধ্যে সুন্দর রঙিন গোলাকার আভা দেখা যায়, তারই কেন্দ্রে সব সময়ই থাকে খুব ছোটো এক টুকরো রেডিয়ম, ইউরেনিয়ম বা থোরিয়ম। এর ভাঙন থেকে এই আভা-মণ্ডলীর সৃষ্টি। যতই দিন যায় এই রঙিন মণ্ডলীর রং ততই গাঢ় হোতে থাকে। মণ্ডলীর আকার ও তাদের রঙ দেখেই বিজ্ঞানী ব'লে দিতে পারেন ঐ অভ্রের টুকরো কত বছরের পুরোনো। এরূপ পরীক্ষায় আজ স্থির হয়েছে যে প্রায় দুশো কোটি বছর আমাদের পৃথিবীর বয়স।

পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়ার আরো দুটি উপায় জানা গেছে। পৃথিবীর ভূমিঅংশ থেকে অনেক রকমের জিনিস জলের সঙ্গে মিশে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তার মধ্যে নুনই শুধু দিনের পর দিন জমা হোতে থাকে, আর অন্য জিনিস বেশির ভাগই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নূতন জিনিসের সৃষ্টি করে। সমুদ্রে কতটা নুন এখন জমা আছে এবং প্রতি বছর কী পরিমাণ নুন নদীর জলের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তার হিসেব করলে সহজেই সমুদ্রের বয়সের একটা মোটামুটি খবর জানা যায়। কিন্তু এই উপায়ের উপর খুব বেশি নির্ভর করা যায় না, কারণ এখন ভূমিঅংশ ও নদীর যে অবস্থা দেখা যায় পূর্বেও ঠিক এরূপ ছিল তা বলা চলে না। আর যেসব স্থানে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে সেসব স্থানে কী পরিমাণ নুন জমা ছিল তার কোনো খবর পাওয়া সম্ভব নয়। নানা রকম অবস্থার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর এই কলেবর গড়ে উঠেছে, কাজেই যে পরিমাণ নুন পূর্বে সমুদ্রে গিয়ে জমা হোত প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তার পরিমাণেরও নিশ্চয় ভেদ

হয়েছে। এই সব নানা রকম অনিশ্চয়তার বিচার করে জানা গেছে যে প্রায় দশ কোটি বছর ধরে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে।

সৃষ্টির পরে নানা রকম প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে যেসব বস্তুপদার্থ পৃথিবীর উপর স্তরে স্তরে জমা হয়েছে তার গভীরতা দেখে পৃথিবীর বয়সের একটা হিসাব বিজ্ঞানীরা করেছেন। পরীক্ষায় জানা গেছে এসব জমাট স্তরের গভীরতা প্রায় ৭০ মাইল, আর একফুট গভীর জিনিস জমা হোতে লাগে প্রায় ৯০০ বছর, কাজেই ৭০ মাইল জিনিস জমা হোতে লেগেছে প্রায় ৩৩ কোটি বছর। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে বস্তুপদার্থ পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে জমা হয়েছে, কিন্তু তা কখনো হয় না। বড়ো বড়ো নদীর মোহানায় যে পরিমাণ জিনিস জমা হয় সমুদ্রের তীরে যেখানে নদী নেই সেখানে জমা হয় অনেক কম। পৃথিবীর বয়স হিসেব করার এই তিনটি উপায়ের ভিতর বিজ্ঞানীদের মতে প্রথম উপায়ই সবচেয়ে ভালো, শেষের উপায় দুটির মধ্যে নানা রকম অনিশ্চয়তা রয়েছে ব'লে তাদের প্রয়োগ করা হয় না।

পৃথিবীর বয়স স্থির করতে গিয়ে যে দুশো কোটি সংখ্যা হিসেব কষে বের করা হোলো আমাদের সহজ বোধের ভিতর দিয়ে তার ধারণা করা অসম্ভব। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝালে হয়তো বুঝবার সুবিধা হোতে পারে। মনে করা যাক সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর উপর যেসব ঘটনা ঘটেছে তার ধারাবাহিক ইতিহাসের একটি "ফিল্‌ম্‌" তৈরি করা হয়েছে, আর সিনেমাতে সেই ফিল্‌ম্‌ দেখাতে ঠিক ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রথম বারো ঘণ্টায় যে বিস্ময়কর দৃশ্য আমাদের চোখে ফুটে উঠবে তার সবই আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত, তারপর ৮ ঘণ্টায় দেখতে পাওয়া যাবে কী ক'রে প্রাণের প্রথম প্রকাশ হোলো একটি অদৃশ্য জীবকোষকে বাহন ক'রে, আর এই প্রাণলোক নানা বৈচিত্র্য ও

সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে কী ক'রে মৃত্যুকে জয় ক'রে অগ্রসর হয়ে চলেছে। তারপর তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট সময়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে অতি অদ্ভুত আকারের সব অতিকায় জীবজন্তুর আবির্ভাব ও দেহের শক্তি এবং হাড়মাংসের অসামঞ্জস্য থাকায় তাদের লোপ পাওয়া। তারপর ৪৫ মিনিটের ভিতর দেখা যাবে স্তন্যপায়ী জীবের প্রকাশ। এই ফিল্‌ম্‌ শেষ হওয়ার মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড আগে দেখব মানুষের প্রথম আবির্ভাব; ভূতত্ত্বের ২৪ ঘণ্টায় মানবজাতির ইতিহাসের অস্তিত্ব পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি নয়।

স্তরবিন্যস্ত পাহাড়ের (Stratified Rocks) গায়ে প্রাণীর চিহ্ন ও পাথরে রূপান্তরিত প্রাণীর দেহাবশিষ্ট থেকে পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেছে। অতি পুরোনো পাহাড়কে ভৌতাত্ত্বিক অজৈবিক পাহাড় (Azoic Rocks) নাম দিয়েছেন; হিসেব করে জানা গেছে এদের বয়স ৮০ কোটি বছরেরও উপরে। এসব পাহাড়ের গায়ে কোনো প্রকার জীবের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, কাজেই মনে করা যেতে পারে জল ও স্থলে ভাগ হওয়ার পরে প্রায় ৮০ কোটি বছর পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। তবে এ বিষয়ে জোর ক'রে কিছু বলা যায় না, কারণ অস্থিবিশিষ্ট প্রাণী ও কঠিন আবরণযুক্ত প্রাণীর চিহ্ন বহুযুগ পরেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ও নরমদেহধারী কোনো প্রাণীর ছাপ পাথরের গায়ে থাকতে পারে না। তাই ৮০।৯০ কোটি বছর আগে এ ধরনের কোনো প্রাণী পৃথিবীতে ছিল কি না তার মীমাংসা করা এখন অসম্ভব। নরমদেহবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রাণী আমরা এখন পৃথিবীতে দেখতে পাই, কিন্তু এরা লোপ পেলে কোটি কোটি বছর পর এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার মতো কোনো চিহ্ন এরা রেখে যাবে না।

এর পরবর্তী যুগের নাম প্রথমজৈবিক (Lower Palaeozoic) যুগ। এই যুগের পাহাড়ে জীবসৃষ্টির সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। অ্যাল্‌গে নামে যে এক জাতের শ্যাওলার কথা বলা হয়েছে, যাকে ভৌতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীতে প্রাণের সর্বপ্রথম প্রকাশ ব'লে মনে করেন, তা পাওয়া গেছে এই যুগের পাহাড়ের ভিতর। তারপর পাওয়া যায় কতকগুলি সামুদ্রিক পোকা ও মাছের চিহ্ন, কিন্তু কোনো স্থলজ প্রাণী বা উদ্ভিদের চিহ্ন এই সময়ে দেখা যায় না। এসব পোকা ও মাছ ৪০।৫০ কোটি বছর আগে এসেছিল পৃথিবীতে। ক্রমে ক্রমে জলবায়ুর পরিবর্তনে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন হোলো। বৃষ্টি ও জলের ধারা পাহাড় পর্বত থেকে পাথরের টুকরো ও মাটি বয়ে এনে জমা করতে লাগল জলাশয়ে, অগভীর হয়ে উঠল এসব জলাশয়। মৎস্যযুগের শেষভাগে কোনো কোনো জলজ প্রাণী ডাঙায় উঠে বাস করতে শুরু করল ; তখন থেকেই আস্তে আস্তে সৃষ্টি হোলো স্থলজ উদ্ভিদ। তারপর একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ববর্তী যুগের অনেক জীবই লোপ পেল, কিন্তু কতকগুলি জীব তাদের দেহে সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন ক'রে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল। ক্রমে ক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়ে নূতন প্রকারের প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখা দিল।

প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকায় খুব বড়ো বড়ো গোধিকা অর্থাৎ টিকটিকি জাতীয় জীবের সৃষ্টি হয়েছিল ; এদের মধ্যে শুধু দুই জাতের কঙ্কাল সেখানে পাওয়া গেছে। এই গোধিকাগুলি দেখতে ছিল অত্যন্ত বিশ্রী, আকার ছিল মস্ত লম্বা প্রায় ৯।১০ ফুট, পিঠের উপর ছিল বেশ বড়ো একটা ডানা। মাংস ছিল এদের খাদ্য। ২০ কোটি থেকে ১৫ কোটি বছরের মধ্যে এই পৃথিবীর প্রায় সবগুলি সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছিল। আটলাণ্টিক ও ভারতমহাসাগরে কঠিন মাটির তল বেরিয়ে

পড়েছিল, শুধু প্রশান্তমহাসাগরের কোনো কোনো স্থানে কিছু জল ছিল। এই জলের অভাবে তখন প্রায় সব জীবজন্তুই লোপ পেয়েছিল, শুধু কুমীর জাতীয় একপ্রকার জীব মাটিতে গর্ত ক'রে কোনো রকমে বেঁচে ছিল। তারপর ১৫ কোটি থেকে ১০ কোটি বছরের মধ্যে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের অবসান হওয়ার পর শুকনো সমুদ্র আবার জলে ভরতি হয়ে উঠল। এর পরই দেখা যায় অনেক নূতন নূতন গাছপালা ও অত্যন্ত অদ্ভুত সব জীবজন্তুর সৃষ্টি। প্রায় ৯ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকাতে তিন শিং-ওয়ালা এক জন্তুর আবির্ভাব হয়েছিল, এই জন্তুটা ছিল খুব বড়ো, প্রায় ২৫ ফুট দীর্ঘ আর প্রায় ১০ ফুট উঁচু, তার শিং এক-একটা ছিল প্রায় ৪।৫ ফুট লম্বা। এর বাচ্চা হোত ডিম থেকে, আর ডিমগুলোও ছিল মস্ত বড়ো বড়ো।

এই সময়ে পাখির মতো ডানাওয়ালা একরকম অদ্ভুত জন্তু দেখা দিয়েছিল, উত্তর আমেরিকাতে তাদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এদের ডানা ছিল মস্ত বড়ো, ডানা মেললে ১৮।১৯ ফুট জায়গা জুড়ে থাকত; কিন্তু যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয় এদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ডানার জোর না থাকায় না পারত ভালো করে উড়তে, আর পায়ের জোর না থাকায় না পারত মাটিতে ভালো করে হেঁটে বেড়াতে। এদের শরীর ছিল খুব বড়ো ও ভারি, তুলনায় পা ছিল সরু। সেই পায়ে দেহের ঐ ভয়ানক ওজন রাখতে নিশ্চিত তারা বিপন্ন হোত। বোধ হয় জলের মধ্যে ডানা মেলে এরা দেহের ভার রক্ষা করত, না হয় কিছু কাল বসত, আবার উড়ত, তারপর আবার বসত।

উত্তর আমেরিকায় আরো কতকগুলি অদ্ভুত জন্তুর খবর পাওয়া যায়, এদের নাম দেওয়া হয়েছে ডাইনোসর। তাদের বিপুল দেহ, লেজ মস্ত মোটা ও লম্বা, পা অনেকটা পাখির মতো, বেশ তাড়াতাড়ি চলতে

পারত। পিছনের পায়ে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে সমস্ত শরীরটা মাটির উপর তুলতে পারত, লেজ দিয়ে শরীরের ওজন ঠিক রাখত যাতে না পড়ে যায়। মাংসই ছিল এদের জীবিকা। এইখানে ব'লে রাখা উচিত এই সব জীবের মাংসবিশিষ্ট সমস্ত শরীর কেউ দেখেননি। কিন্তু যাঁরা জীবদেহ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন তাঁরা জীবের হাড়গোড় পেলেই তার থেকে সমস্ত চেহারাটা খাড়া করতে পারেন, এমন কি আন্দাজ করতে পারেন তাদের স্বভাবটা কী রকম। অনেক সময় কঙ্কালও পাওয়া যায় না, শুধু পাথরে কঙ্কালের দাগ দেখে এসব প্রাণীর আকার স্থির করা হয়।

ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে সরীসৃপ জাতীয় কোনো কোনো জীব পাখির আকার পেয়েছে ব'লে পণ্ডিতেরা মনে করেন। সব পাখির গায়েই পালক আছে, এই পালক তাদের সহজ গতিতে বাধা জন্মায় ব'লে প্রচণ্ড উত্তাপ ও দারুণ ঠাণ্ডার হাত থেকে পাখিকে বাঁচিয়ে রাখে। এই পালকের আবরণ থাকায় এরা বেশ স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়াত; এদের গতিও পূর্ববর্তী প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আস্তে আস্তে এরা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদেশে ছড়িয়ে পড়ল; যে-ঠাণ্ডায় এদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপের দল মারা পড়ত গরম পালকের পোষাক গায়ে দিয়ে এরা সহজেই তা সহ্য করতে লাগল। জার্মানীতে দুটি পাখির কঙ্কাল পাওয়া গেছে, এরাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পাখি ব'লে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এদের কোনো ঠোঁট ছিল না, সরীসৃপের মতো চোয়ালে এক সার দাঁত ছিল এবং লেজ ছিল ডাইনোসরের মতো লম্বা। ডানায় যদিও পালক ছিল কিন্তু সেগুলো দেখতে ছিল ডাইনোসরের হাতের মতো।

মঙ্গোলিয়ার অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমিতে পুরোনো জীব-জন্তুর অনেক হাড়গোড় পাওয়া গেছে। একদল পরিসন্ধানকারী

পুরাকালের চিহ্ন খোঁজ করার জন্যে পাঁচবার সেখানে ভ্রমণ করেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে এঁরা যখন প্রথম সেখানে পরিসন্ধান যাত্রায় গিয়েছিলেন তখন ডাইনোসরের কতকগুলি ডিম খুঁজে পান। সেই প্রথম জানা গেল এরা ডিম পাড়ত। দুই জাতের কঙ্কাল এখানে পাওয়া গেছে; একজাত ছিল খুব বড়ো, প্রায় ৬০।৭০ ফুট লম্বা, অন্যজাত ছোটো প্রায় ৯।১০ ফুট মাত্র লম্বা। যে ডিমটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল তা লম্বায় ছিল ৯ ইঞ্চি, একটি ৯ ফুট জন্তুর কঙ্কালের পাশে পড়েছিল। পরিসন্ধানীর দল ৭০।৮০টি ডিম ছাড়া ৭৫টি মাথার খুলি ও ১৪টি কঙ্কাল সেখানে পেয়েছেন। সে জায়গার মাটি পরীক্ষা ক'রে তাঁরা জেনেছেন যে তার উৎপত্তি কাল ৯ কোটি বছরেরও বেশি। মঙ্গোলিয়ার মতো শুকনো জায়গা ভূপৃষ্ঠে আর কোথাও নেই, প্রায় ১৫ কোটি বছর ধ'রে এই জায়গা কখনো জলের নিচে যায়নি, অথচ ঐ সময়ের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক জায়গা কিছুকালের মতো জলে ডুবে গিয়েছিল। এই গোবি মরুভূমিতে অনেক রকমের পাখিও এঁদের চোখে পড়েছিল; একটা মস্ত হাড়গিলে জাতীয় পাখি তাঁরা গুলি করে মেরেছিলেন, তার এক-একটি ছড়ানো ডানার মাপ প্রায় দশ ফুট।

এক অদ্ভুত রকমের বুনো গাধা তাঁরা সেখানে দেখেছিলেন; এই গাধাগুলো প্রায় ৪।৫ ফুট উঁচু, পেটের দিকটা সাদা আর সব অংশ হলদে। জোরে ছুটতে পারে না ব'লে গাধার একটা দুর্নাম আছে কিন্তু সমস্ত গর্দভজাতির কলঙ্ক দূর করেছে গোবিমরুভূমির গাধা তাদের অদ্ভুত দ্রুত গতি দেখিয়ে। এরা ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইল বেগে দৌড়য়, একখানি দ্রুতগামী ইঞ্জিনের বেগের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। বেলুচিথেরিয়ম নামে এক অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল সেখানে পাওয়া গেছে; এই জন্তু ছিল ১৭।১৮ ফুট উঁচু, ২৪।২৫ ফুট লম্বা, বড়ো হাতির চেয়েও অনেক বড়ো।

প্রায় তিনকোটি বছর আগেকার উদ্ভিজ্জভোজী জীব এরা। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে এই সন্ধানীর দল অত্যন্ত অদ্ভুত একটা জন্তুর হাড় ও চোয়াল আবিষ্কার করেছিলেন। এদের উপরের দুটো দাঁত মস্ত বড়ো, প্রকাণ্ড শিং-এর মতো, আর নিচের দাঁত দুটো অনেকটা গোরুর দাঁতের মতো, কান দুটো ছিল হাতির কানের মতো। তাঁদের শেষ পরিসন্ধান যাত্রায় এক জায়গাতে তাঁরা অনেকগুলি জন্তুর হাড়গোড় পেয়েছিলেন। ঐ জায়গা পরীক্ষা ক'রে তাঁরা স্থির করেছেন সেখানে বহুকাল আগে একটা বড়ো হ্রদ ছিল এবং তাতে নানা রকমের জলজ উদ্ভিদ ছিল। এই সব জন্তু ঐ উদ্ভিদ খেতে গিয়ে হ্রদের জলে নামত। তাদের দেহের বিরাট ওজনের চাপে পা কাদার মধ্যে বসে যেত, আর সেইখানেই তারা মারা পড়ত। আস্তে আস্তে সেই হ্রদ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু জন্তুগুলোর কঙ্কাল সেই শুকনো কাদার মধ্যে এখনও রয়েছে, মাটি খুঁড়ে পরিসন্ধান যাত্রীরা এসব কঙ্কালই আজ উদ্ধার করেছেন।

৯ কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকায় এক প্রকাণ্ড জন্তুর আবাস ছিল; পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এত বড়ো জন্তু দেখা যায়নি। এদের দেহ ছিল প্রায় ৯০ ফুট লম্বা, আর ৩০ ফুট উঁচু। আট দশটা হাতির সমান ছিল এদের এক-একটার ওজন। দেহের ওজন এত বেশি হওয়াতে এরা অনেক কষ্টে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। জলা জায়গা ছাড়া এরা থাকত না, জলে কতকটা ভাসিয়ে রাখত ব'লে শরীরের ওজন অনেকটা কমে যেত। এদের লেজ ও ঘাড় ছিল খুব লম্বা, ঘাড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ ফুট; এত লম্বা ঘাড় থাকাতে জলের মধ্যে খাবার সুবিধা করে নিতে পারত।

এসব অতিকায় জন্তুদের ভিতর একটা জিনিস চোখে পড়ে, এদের শরীরের মধ্যে যেন ভালোরকম ব্যবস্থা হয়নি। সৃষ্টির আরম্ভে, প্রচুর

হাড় মাংসের অপব্যয় ক'রে প্রকৃতি যেন শিক্ষানবিশির ভাবে এসব জন্তু গড়েছিল; তাই কোনোটার দেহ ছিল ৭০।৮০ ফুট লম্বা, তুলনায় পা ছিল অনেক সরু। এই সরু-পায়ে অত বড়ো দেহের ওজন কিছুতেই রাখা যায় না, বেচারা তাই দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রেও দাঁড়াতে পারত না, কাজেই লোপ পেল সে জাতের জন্তু। এই শিক্ষানবিশির কাজে প্রকৃতি এখন অনেকটা হাত পাকিয়ে ফেলেছে, যে-দেহ আজকাল সৃষ্টি হচ্ছে তার ভিতর শক্তি ও পদার্থের একটা সামঞ্জস্য রেখে যাতে এসব জীব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথম জীবসৃষ্টির এই সব অসমর্থ জন্তু লোপ পাওয়ার পর এখন হতে প্রায় ২½ কোটি বছর আগে এমন সব জীব দেখা দিতে লাগল যারা মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচে, তাদের বলি স্তন্যপায়ী জীব। বাঘ, সিংহ, গোরু, ঘোড়া, ছাগল, কুকুর, এরা সবই স্তন্যপায়ী জীব। সেই পুরোনো ২½ কোটি বছরের স্তন্যপায়ী জীবের আকার অনেকটা আজকালকার জীবেরই মতো; এদের অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে মিশর দেশে। তাদের মধ্যে একজাতের জীব ছিল দেখতে ছোটোখাটো হাতির মতো, কিন্তু চামড়া গণ্ডারের মতো পুরু। এদের মুণ্ডও ঠিক হাতির মতো নয়, নাকের নিচে থেকে খুব ধারালো দুটো লম্বা খড়্গ বেরিয়ে থাকত, চোখের উপরেও আরো দুটো ছোটো ছোটো খড়্গ ছিল।

এক কোটি থেকে দশ লক্ষ বছরের মধ্যে বাঘের মতো এক রকমের জন্তু সৃষ্টি হয়েছিল, এসিয়া ও য়ুরোপে এদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। খুব বড়ো বাঘ বা সিংহের মতো ছিল এদের শরীর, মুখে ছিল ভয়ানক ধারালো মস্ত লম্বা একজোড়া দাঁত; এত বড়ো দাঁত নিয়ে কী ক'রে যে মুখ বন্ধ করত ও খেত তা বুঝতে পারা যায় না। না খেতে পেলেই তো এদের মরার কথা, তবু কী উপায়ে যে এত দিন বেঁচে ছিল ভেবে

পাওয়া যায় না। প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে যখন মানুষ জন্মেছে তখন তার সমকালীন এক প্রকাণ্ড জন্তু ছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছে মেগাথেরিয়ম। তারা লম্বায় ছিল প্রায় ২০ ফুট, উঁচুতে ১২ ফুট, বাঁচত উদ্ভিদ খেয়ে। অনুমান করা যায় এরা তখনকার মানুষের পোষ মেনেছিল, কেননা যে বাসগুহায় মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে সেখানে এদেরও কঙ্কাল দেখা যায়।

এই সময়ে বনমানুষ জাতীয় এক স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কালক্রমে দেহের পরিবর্তন হোতে হোতে এরাই আস্তে আস্তে মানুষে এসে দাঁড়িয়েছে। মানবের ক্রমবিকাশের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কঙ্কাল ও তাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি পরীক্ষা ক'রে। যবদ্বীপে একটি জীবের মাথার খুলি, কয়েকটি দাঁত ও কয়েক খণ্ড হাড় পাওয়া গেছে যার থেকে এই জীবকে বানরের চেয়ে উন্নত এক প্রকার নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ব'লে মনে করা যেতে পারে। এর মস্তিষ্ক বানরের মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক বড়ো, সম্ভবত এই জীব সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলাফেরা করত। এর নাম দেওয়া হয়েছে পিথেকনথ্রোপস ইরেক্টস্ (Pithecan-thropus Erectus)। আন্দামান, অস্ট্রেলিয়া ও বুসম্যানবাসী আধুনিক মানুষের মাথার খুলির সঙ্গে যবদ্বীপে পাওয়া এই খুলিটির অনেক মিল দেখা যায়। চীনের পিকিং শহরের কয়েক মাইল দূরে একটি গুহায় পিথেকনথ্রোপস ইরেক্টসের চেয়েও প্রাচীন যুগের মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে। হাইডেলবার্গে একটি চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে, গঠন দেখে মনে হয় এই হাড় এক বৃহদাকার মানুষের অস্থি; এদের তৈরি অনেক জিনিসও সেখানে পাওয়া গেছে। Sussexএ Piltdown নামক স্থানে যে মাথার খুলি পাওয়া গেছে তা দেখে মনে হয় যে ইহাই প্রকৃত

বুদ্ধিমান মানুষের ঠিক পূর্ববর্তী প্রায়-মানুষের চিহ্ন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানুষের ক্রম-বিকাশের ধারা স্থির করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের তৈরি জিনিস ও তাদের কঙ্কাল থেকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঙ্কাল পাওয়া সম্ভব হয় না, তাই তাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি পরীক্ষা ক'রেই পারম্পর্য স্থির করতে হয়। মানবের ক্রম-বিকাশের তিনটি যুগ নির্ধারিত হয়েছে, প্রথম—পাথুরে যুগ; এই যুগে পাথরের জিনিস প্রথম তৈরি হয়েছিল; দ্বিতীয়—ব্রোঞ্জ যুগ, এই যুগে ব্রোঞ্জের তৈরি জিনিসের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয়। তৃতীয়—লৌহ যুগ, এই যুগে প্রথম লোহার ব্যবহার মানুষের প্রয়োজনে আসে। এক প্রকার জীবের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেছে যারা পৃথিবীতে এসেছিল প্রায় ৪০ হাজার বছর আগে, এদেরই প্রকৃত মানুষ ব'লে অনুমান করা হয়েছে। এরা আগুনের ব্যবহার জানত, ও শীতের এবং বন্যজন্তুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে গুহায় বাস করত; এদের সঙ্গে উত্তর আমেরিকার আধুনিক ইণ্ডিয়ানদের অনেক সাদৃশ্য আছে। ফ্রান্স এবং স্পেনেই আধুনিক মানুষের প্রকৃত পূর্বপুরুষের সন্ধান পাওয়া গেছে; পাহাড়ের গায়ে ও গুহার ভিতর এদের আঁকা ছবি ও ব্যবহারের জিনিসপত্র রক্ষিত আছে। তবে এসব চিহ্ন থেকে নিঃসংশয়ে বলা চলে না যে পশ্চিম য়ুরোপই আদি মানুষের জন্মস্থান; কে জানে অন্য কোথাও হয়তো প্রকৃত মানুষের চিহ্ন আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে।

আদিম যুগে মানুষের স্বভাব অনেকটা বন্যজন্তুর মতোই ছিল, পশু শিকার ক'রে তারা আহার জোগাত, থাকত পাহাড়ের গুহায়। হাজার হাজার বছরের কথা, বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পেল কথা বলার শক্তি। এই উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে জানাজানি হওয়াতে মানুষের সভ্যতার পত্তন হোলো, শ্রেষ্ঠ ব'লে প্রাণিজগতে মানুষ তার আসন প্রতিষ্ঠা

করল। যে-বনে তারা থাকত সেখানে কতবার গাছে গাছে ঘর্ষণ লেগে আগুন জলেছে; তার থেকে তারা শিখেছে আগুন জালাবার উপায়। এই আগুনে সেই শক্তি যে-শক্তি সমস্ত সৃষ্টির মূলে। এই আগুন মানুষের উন্নতির কাজে কত লেগেছে তার সীমা নেই। কাঠে কাঠে ঘ'ষে বানর যদি নিজের ইচ্ছামতো আগুন জালাতে পারত তাহলে জীবনযাত্রায় সেও আজ অনেক উঁচুস্তরে উঠত। এই আগুনের আশ্চর্য রহস্য, তার দীপ্তি, তার ভীষণতা এবং উপকারিতা দেখে মানুষ আগুনের মধ্যেই দেবতার উজ্জল শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি ক'রে তার পূজা করেছে। ভেবে দেখলে দেখা যায় এই আগুনই মানুষের সভ্যতার প্রধান বাহন, এরই প্রভাবে তার আহার বিহার, তার আলো, তার নানা প্রকার যন্ত্রশক্তি। সাধারণ জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ না থেকে মানুষের ভিতর ক্রমে ক্রমে জেগে উঠেছে তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা। বুদ্ধির বলে সে প্রকৃতির লুকোনো খবর সব আদায় ক'রে নিচ্ছে, ইন্দ্রিয়বোধের নির্দিষ্ট সীমা দিয়ে যাচাই করা যে-জ্ঞান তাকে দিয়েছে সে বাতিল ক'রে। রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়ে' বলেছেন "মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশী হয়েছে। মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশ-লোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ লোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে।" জীবনযাত্রায় অদ্ভুত দ্রুত গতিতে মানুষ উঁচু থেকে উঁচু স্তরে উঠছে।

উপসংহার

জানি না কোন্ অতীত যুগে বিশ্বের এক সুদূর প্রান্তে নক্ষত্রে নক্ষত্রে ধাক্কা লেগে একটা খণ্ড প্রলয় ঘটেছিল। প্রলয়ের সেই প্রবল অভিঘাতে একটি নক্ষত্রের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্পের মেঘ। তেজ ছড়িয়ে দিয়ে জমাট বেঁধে এই জলন্ত বাষ্পপিণ্ডই সৃষ্টি করেছে গ্রহমণ্ডলীর। কেউ কেউ আন্দাজ করেন প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এরূপ দুর্ঘটনার এলাকায় গিয়ে ধরা পড়ে আমাদের সূর্য, অপঘাতের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে নিজের তহবিল থেকে কিছু সম্বল তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। তার এই ত্যাগের দানেই আজ গ্রহমণ্ডলীর খ্যাতি।

পৃথিবীসৃষ্টির শুরু থেকে বহু কোটি বছর ধ'রে চলেছে তার উপর তেজের তাণ্ডবলীলা। এসব আকস্মিক উৎপাতের প্রচণ্ড আঘাতে বিভিন্ন অজৈব পদার্থের উলটপালট ও ভাঙাগড়ায় পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্রের সৃষ্টি ও পরিবর্তন চলছিল। তারপর, কোথা থেকে, কখন, কেমন ক'রে দেখা দিল প্রাণ ও মন! অতিক্ষুদ্র জীবকোষকে বাহন ক'রে জড়ের বিপরীতধর্মী জিনিস আপনার প্রাণ মন ও সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ একটা যুগে এল পৃথিবীতে। সৃষ্টির আরম্ভে প্রচুর হাড়মাংসের অপব্যয় ক'রে প্রকৃতি যেন শিক্ষানবিশির ভাবে কতকগুলি অতিকায় অসমর্থ জীব গড়েছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই ক'রে তারা বেঁচে থাকতে পারল না, লোপ পেল তাদের জাত। প্রথম জীবসৃষ্টির এসব অসমর্থ জন্তু লোপ পাওয়ার পর প্রায় দশলক্ষ বছর

আগে বনমানুষ জাতীয় এক স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব দেখা যায় ; কালক্রমে দেহের পরিবর্তন হোতে হোতে এরাই আস্তে আস্তে মানুষে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পৃথিবীর মতো অতিক্ষুদ্র জড়-পিণ্ডকে আশ্রয় ক'রে যে-প্রাণের উৎস দেখা দিল, অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণাকে বাহন ক'রে, তাকে তো ক্ষুদ্র ব'লে উপেক্ষা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়ে' বলেছেন "কী মহিমার ইতিহাস সে এনেছিল কত গোপনে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন ক'রে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না।" এ যেন একটা মায়ার পর্দা খাটানো হয়েছে আমাদের ভুলিয়ে রাখতে ; সাধারণ অনুভূতির কাছে প্রকৃতির অন্তরের খবর গোপন করাই যেন উদ্দেশ্য। কিন্তু পারল না, বোধের চেয়ে মানুষের বুদ্ধির দৌড় অনেক বেশি, তারই জোরে প্রকৃতির লুকোনো খবর সে আদায় করে নিল।

ইন্দ্রিয়বোধের নির্দিষ্ট সীমা ও তার বিশেষ প্রকৃতি দিয়ে দেখা এই জগৎটার নিতান্ত সাধারণ পরিচয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। অপূর্ব বুদ্ধির কৌশলে বোধের সীমা বাড়িয়ে অতি প্রকাণ্ড বড়ো ও অতি প্রকাণ্ড ছোটোদের খবর জানতে সে বেরিয়ে পড়ল। আবরণ যখন অনেকটা সরে গেল অত্যন্ত আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে দেখা দিল এই বিশ্বের পরিচয়। বোধশক্তির ভিতর দিয়ে পাওয়া বিশ্বের যে মোটামুটি চেহারা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তার আসল রূপ যে একেবারে স্বতন্ত্র হোতে পারে এ ধারণা তখন থেকেই মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠল। অতি ছোটোদের মিলিয়ে নিয়েই অতিবড়োরা বড়ো হয়েছে,

অদেখারাই দিয়েছে দৃশ্যমান জগতের রূপ ; তাই অদেখাদের দলের সন্ধানে চলল অভিযান। গোটা কয়েক মূল মসলার যোগাযোগে পদার্থ জগতের এই অভিনব বৈচিত্র্য, মানুষের মনে এ ধারণাই এতদিন প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদের ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছিল বিরানব্বুইটিতে, কিন্তু দেখা গেল এই বিরানব্বুই সংখ্যা নিয়ে কারবার করলে আর সহজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা চলে না। পরীক্ষায় জানা গেল যে এই মূলমসলাগুলিও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য অণুকণার সমষ্টি। এই অণুকে ভাগ ক'রে আরো ছোটো কণা পাওয়া গেছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পরমাণু। এই পরমাণুর দলই জগতে কিছুকাল খ্যাতি পেয়েছিল পদার্থের ক্ষুদ্রতম মূল-অংশ ব'লে। কিন্তু মানুষের সম্মিলিত অভিঘাতের বেগ তা'রা সইতে পারল না, অভ্যন্তরে অত্যন্ত সংগোপনে রেখেছিল যে বৈদ্যুতকণা দুর্দমনীয় বৈজ্ঞানিক শক্তির কাছে হার মেনে উজাড় করে দিতে হোলো তাদের। স্বাতন্ত্র্যের গৌরব আর তারা রক্ষা করতে পারলে না, সূক্ষ্মতর ভাগ বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিতে হোলো মৌলিক পদার্থের পর্যায় থেকে। এই বৈদ্যুতকণাদের নাম হোলো ইলেক্‌ট্রন (Electron)। এরা নিগেটিভ বৈদ্যুতকণিকা। এদের বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতকণাও বেশিদিন বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে আত্মগোপন করতে পারল না ; তাদের নাম হোলো প্রোটোন, তারা পজিটিভ বৈদ্যুতকণিকা। ইলেকট্রন অত্যন্ত হালকা, কিন্তু প্রোটোন ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দু হাজারগুণ বেশি ভারি। এখানে দাঁড়ি কাটলেই চলত, কিন্তু ১৯৩২ সালের পর মৌলিকত্বের দাবি নিয়ে পরমাণুর ভিতর থেকে আরো দুটি মূলকণা এসে হাজির হোলো ; তাদের নাম হোলো ন্যুট্রন (Neutron) ও পজিট্রন (Positron)। ন্যুট্রন বিদ্যুৎহীন কণিকা, ওজনে প্রোটো-

নের চেয়ে সামান্য একটু ভারি ; আর পজিট্রন পজিটিভ বৈদ্যুতকণিকা কিন্তু তার ওজন ও বৈদ্যুতের পরিমাণ ইলেকট্রনের সমতুল্য।

ওজনের গুরুত্বে প্রোটোন-ন্যুট্রন তাদের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে পরমাণুর কেন্দ্রে। সৌরজগতের মাঝখানে আছে সূর্য আর তার চারদিকে লাটিমের মতো পাক খেতে খেতে ঘুরছে গ্রহের দল; তেমনি পরমাণুর মাঝখানে থাকে একটি প্রোটোন বা একাধিক প্রোটোন-ন্যুট্রন আর তাদের কেন্দ্র ক'রে পাক খেতে খেতে অদ্ভুত দ্রুতবেগে ঘোরে ইলেকট্রনের দল। সাধারণ বোধের ভিতর দিয়ে যেসব জিনিসকে বিভিন্ন জিনিস ব'লে জানি তাদের মূলে রয়েছে এসব বৈদ্যুতের দল। সোনা, রুপা, সীসে এদের মূলগত কোনো পার্থক্য নেই, শুধু প্রোটোন, ন্যুট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যার কমিবেশি ও দূরত্ব নিয়ে কোনোটা সোনা, কোনোটা বা সীসে। একথা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হোতে হয়, যে-বইটা এখন পড়ছি তাকে দেখছি বটে কঠিন ও স্থির, কিন্তু তার অসংখ্য মূল উপাদান কঠিনও নয় স্থিরও নয়; তা'রা বহুকোটি বৈদ্যুতমণ্ডলীর সমষ্টি, ভিতরকার তেজে সর্বদাই চঞ্চল। সৌরজগতে সূর্য থেকে গ্রহের দল যেমন কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে, এই পরমাণু জগতেও আয়তনের অনুপাতে ইলেকট্রন প্রোটোনের দূরত্ব তার চেয়ে কম নয়, বেশির ভাগ স্থানই ফাঁকা পড়ে আছে। অথচ এই ফাঁকা অদৃশ্য পরমাণুর দলকে মিলিয়ে নিয়েই অতিবড়োরা বড়ো হয়ে আমাদের চোখে ধরা দিয়েছে। কঠিন মাটির উপর প্রকাণ্ড ঘরবাড়ি তৈরি ক'রে স্বচ্ছন্দে বাস করছি, যদিও মাটির মূল উপকরণগুলো এই ফাঁকা পরমাণুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়; মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রায় এই অনীয়সী বৈদ্যুতের দলের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ তো ঘটছে না। খুব ছোটো দেখার চোখ আমাদের নয়, তাই পরমাণু মহলের প্রোটোন ইলেকট্রনের ঘূর্ণি-

নাচ আমাদের অদেখাই রয়ে গেল। জড়জগতের ভিতরকার যে লুকোনো অণুতম জগৎ, বোধের শক্তি দিয়ে তাকে যাচাই করা গেল না, বুদ্ধি দিয়েই তাকে স্পষ্ট ধারণা করতে হোলো।

এই সূক্ষ্মতম বৈদ্যুতকণাদের এমন সব অদ্ভুত আচরণ দেখা যায় যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জড়জগতের ঘটনাবলীর পিছনে রয়েছে তার কারণ, এই কারণটাই যখন মানুষের কাছে অজানা থেকে যায় তখন তাকে স্বীকার করা কঠিন হয়ে ওঠে। তাই আজ অনেকেই বলছেন যে প্রকৃতির ভিতর রয়েছে একটা অবাধ স্বাধীনতা; হয়তো তাই ইলেকট্রন আপন চলার পথ বেছে নেয়, রেডিয়মের সেই পরমাণুটি ভেঙে পড়ে খেয়ালবশে যে ভাঙনের এলাকায় এসে ধরা দেয়। কেউ কেউ কিন্তু ইলেকট্রন ও রেডিয়ম পরমাণুর এই স্বাধীনতার কথা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, মানুষের কাছে হয়তো ইলেকট্রনের চলার পথ বা রেডিয়ম পরমাণুর বেঁচে থাকার কাল অজানা থাকতে পারে, কিন্তু এসব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এমন সব সূক্ষ্মতর নিয়ম মেনে যাদের খোঁজ পাওয়া আজও সম্ভব হয়নি। প্রকৃতির অসীম জ্ঞানের অতি সামান্যই মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছে, তাই বোধের জগতের ভিতর বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যখনই মানুষ তার মনের মধ্যে প্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপ গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করে তখনই বাধে বিরোধ, একই পদার্থ তখন আলাদা রূপ ধ'রে প্রকাশ পায়; প্রকৃতির আসল চেহারার সঙ্গে হয়তো তার এই মনগড়া চেহারার কোনো মিল নেই।

অতিবড়োদের সম্বন্ধেও এই দেখার ভুল যে কোন্ পর্যন্ত পৌঁছয় তারই একটু আভাস দেওয়া দরকার। কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে আকাশে, দিনের পর দিন দেখছি এরা স্থির হয়ে আছে। কিন্তু

আপাতদৃষ্টিতে স্থির ব'লে মনে হোলেও পণ্ডিতদের তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এদের গতি ধরা পড়ে গেছে; জানা গেছে এরা প্রত্যেকেই অগ্নিবাষ্পের এক-একটা বৃহদায়তন পিণ্ড, গতির বেগে বন্দুকের গুলিকেও হার মানায়। সৌরজগতের চেয়ে কল্পনাতীত দূরে আছে ব'লে এদের আকার ও গতি চোখে দেখতে পাইনে। কিন্তু দৃষ্টির ভুল এখানেই শেষ হয়নি; কোনো কোনো নক্ষত্রের ভিতর এমন অনেক খবর লুকোনো আছে যা শুনলেও বিশ্বাস করা কঠিন। দেখে যাদের একটি মাত্র আলোর বিন্দু ব'লে মনে হয় তাদের মধ্যে অনেকগুলি আছে যাদের সঙ্গে দুই বা ততোধিক নক্ষত্র মিলেছে। এদের বলব জুড়ি-নক্ষত্র, য়ুরোপীয় ভাষায় বলে Binary-System। আকাশে Castor ব'লে একটি নক্ষত্র আছে, চোখে দেখলে মনে হয় না এর কোনো সঙ্গী আছে। কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে অর্থাৎ দুরবীন দিয়ে দেখলে এর জুড়িটি সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর এও জানা গেছে যে এই দুটি নক্ষত্রই আবার জুড়ি-নক্ষত্র। এই শেষ কথা নয়, এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে আরো একটি নক্ষত্র যার খবর মিলেছে খুব বড়ো দুরবীনের সাহায্যে। পৃথিবীর বৃহত্তম দুরবীনের তীক্ষ্ণ চোখে আবার এরও একটি সঙ্গী আত্মগোপন করতে পারল না। যাকে দেখি একটি মাত্র স্থির আলোর বিন্দু, তারই ভিতর আত্মগোপন ক'রে আছে ছয়টি নক্ষত্র, সম্পূর্ণ আলাদা তাদের গতি ও চলার পথ, কিন্তু সবাই দলবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে এক অজ্ঞাত লক্ষ্যের দিকে।

বহুকোটি নক্ষত্র মিলে সৃষ্টি হয়েছে একটি নীহারিকা, যার নাম দেওয়া যেতে পারে নাক্ষত্রজগৎ। চোখে এদের দেখা যায় না বললেই চলে, দুএকটিকে শুধু আবছা ধোঁয়ার মতো মনে হয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে বহু দূরে দূরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ নীহারিকা; এরা

উপসংহার

মানুষের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিলেও দূরবীনের সঙ্গে লাগানো ক্যামেরার প্লেটে রেখে গেছে নিজেদের ছাপ। এদের দূরত্ব কল্পনা করতে গেলে বুদ্ধিও হার মানবে। জানা গেছে এই নীহারিকার দলও আবার স্থির হয়ে নেই, এক অজানা লক্ষ্যের দিকে তাদের গতি। শুনলে চমক লাগে কোনো কোনো নীহারিকার বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ২৪।২৫ হাজার মাইল। এত প্রকাণ্ড সব বাষ্পপিণ্ডের এই অসম্ভব দ্রুত গতি বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত করেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন তৈরি হোলে এই জটিল সমস্যার হয়তো একটা মীমাংসা হোতে পারে। কিন্তু নীহারিকার এই প্রচণ্ড গতি যদি সত্যি ব'লেই প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে বিশ্বের বর্তমান ধারণা আমাদের আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আকাশরূপী এই বিশ্বগোলককে তখন বলতে হবে সীমাহীন, আর পরস্পর আকর্ষণে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে একটা সাম্যস্থিতি আছে ব'লে যে-ধারণা এতকাল চ'লে আসছে তা যাবে একেবারে নিরর্থক হয়ে। তখন ভাবতে হবে এই অনন্ত মহাশূন্যের অনির্দিষ্ট পথে এরা সব পরস্পর-সম্বন্ধবিহীন একক যাত্রী। মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে আত্মগোপন ক'রে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছুতে এদের এই মহাদৌড়ের পালা চলেছে তা কল্পনা করব সে বুদ্ধি আমাদের কোথায়।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

১. বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — পাঁচ সিকা +
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী — আট আনা
৩. পৃথ্বীপরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত — পাঁচ সিকা +
৪. আহার ও আহার্য : শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য — এক টাকা *
৫. প্রাণতত্ত্ব : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর — দেড় টাকা +
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী — পাঁচ সিকা *
৭. ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — এক টাকা বার আনা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই। এই অভাবপূরণের জন্য ১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত +
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু +
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু +

* যন্ত্রস্থ   + সচিত্র